গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ

বেতের চারা উৎপাদন, চাষ ও ব্যবহার

- বেত কাঁটাজাতীয় আরোহী উদ্ভিদ ও গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল।
- প্রাচীনকাল থেকেই আসবাবপত্রসহ অনেক কুটির শিল্পে এর ব্যবহার হচ্ছে।
- বৃক্ষের সঙ্গে সাথী ফসল হিসাবে বেত চাষ করে সহজেই বাড়তি আয় করা সম্ভব।

গোল্লা বেতের চারা

পরিচিতি

আমাদের দেশে আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন অমূল্য বনজ সম্পদ। বেত এমনি এক মূল্যবান উদ্ভিদ যা দেশের অর্থনীতি ও পরিবেশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। বাংলাদেশের আবহাওয়া বেত চাষের জন্য খুবই উপযোগী। বেত এক প্রকার কাঁটা জাতীয় আরোহী উদ্ভিদ। সাধারণত অন্য কোন বৃক্ষকে অবলম্বন করে বেত বেড়ে উঠে। লাঠির মত প্রধান অংশই বেতের কান্ড। পরিপক্ক কান্ডই বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে ১০ প্রজাতির বেত পাওয়া যায়। জাতভেদে বেতের ব্যাস ২.৫ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার এবং লম্বায় ১০-৪০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। বর্তমানে বেতের ব্যবহার ব্যাপক হারে বাড়ছে অথচ এদেশে বেতের উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে বেত নেই বললেই চলে। বসত বাড়ীর আশে-পাশে অনাবাদি পতিত জমি, আবাদি জমির সীমানায় জীবন্ত বেড়া এবং বনজ বৃক্ষের সাথে সাথী ফসল হিসাবে বেতের চাষ করা যায়। উন্নত চাষাবাদের মাধ্যমে বাগান সৃষ্টি করে বেত সম্পদ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এতে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের বাড়তি আয়ের উৎস সৃষ্টি হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বিভিন্ন প্রজাতির বেতের প্রাপ্তিস্থান ও ফল পাকার সময়কাল

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রজাতির বেতের প্রাপ্তিস্থান ও ফল পাকার সময়কাল নিচের ছকে দেয়া হলো।

বেত উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতি	প্রাপ্তিস্থান	ফল পাকার সময়কাল
জালি (*Calamus tenuis*)	বাংলাদেশের সর্বত্র	এপ্রিল - জুলাই
কেরাক (*C. viminalis*)	টাংগাইল, সিলেট, ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এর বনাঞ্চল	ফেব্রুয়ারি - এপ্রিল, আগস্ট - অক্টোবর
গোল্লা (*Daemonorops jenkinsiana*)	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও কক্সবাজার বনাঞ্চল	জুন - সেপ্টেম্বর
সুন্দি/বান্দরি (*C. guruba*)	সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল	মে - জুলাই, ডিসেম্বর - ফেব্রুয়ারি
বুদুম (*C. latifolius*)	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এর বনাঞ্চল	এপ্রিল - জুলাই
উদুম (*C. longisetus*)	কক্সবাজারের বনাঞ্চল	মে - আগস্ট
সিতা (*C. erectus*)	চন্দ্রনাথ পাহাড়, সীতাকুন্ড	এপ্রিল - জুন, অক্টোবর - ডিসেম্বর
গৌরি (*C. acanthospathus*)	সিলেটের টিলাগড়; চম্পা পাহাড়, এম্পুপাড়া, বান্দরবান	ফেব্রুয়ারি - এপ্রিল
নলি (*C. travancoricus*)	এম্পুপাড়া, বান্দরবান	মার্চ - মে
মাপুরি (*C. gracilis*)	এম্পুপাড়া, বান্দরবান ও সিলেটের টিলাগড়	জানুয়ারি - মার্চ, জুলাই - সেপ্টেম্বর

জালি বেত

জালি বেতের বীজ

কেরাক বেত

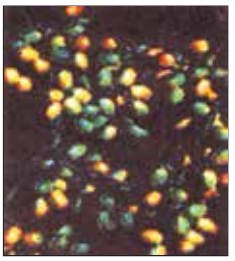

গৌরি বেতের বীজ

কেরাক বেতের বীজ

গোল্লা বেত

গোল্লা বেতের বীজ

নলি বেত

সুন্দি/বান্দরি বেত

সুন্দি/বান্দরি বেতের বীজ

বুদুম বেত

নলি বেতের বীজ

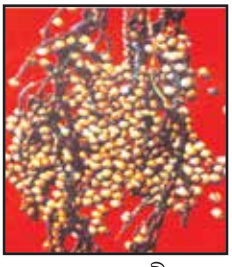

বুদুম বেতের বীজ

উদুম বেত

উদুম বেতের বীজ

মাপুরি বেতের বীজ

সিতা বেত

সিতা বেতের বীজ

গৌরি বেত

মাপুরি বেত

ব্যবহার

বেত দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আসবাব, চেয়ার, টেবিল, সোফা, খাট, লাঠি, ঝুড়ি, টুকরি, দোলনা, সেলফ, ছাতির বাট ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

নার্সারিতে চারা উত্তোলন কৌশল

বেত সাধারণত বীজ ও রাইজোম অথবা সাকার (ভূনিম্নস্থ কান্ড) দিয়ে চাষ করা হয়। তবে ব্যাপক চাষাবাদের জন্য বীজ থেকে চারা উৎপাদন করাই অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক। বেতের চারা উত্তোলনের কৌশল বিভিন্ন ধাপে সম্পন্ন হয়।

ক) বীজ সংগ্রহ

- ১০ প্রজাতির বেতের মধ্যে কেরাক, সীতা, সুন্দি ও মাপুরি বেতের ফুল ও ফল বছরে ২ বার হয়ে থাকে
- অবশিষ্ট প্রজাতির বেতের (জালি, গোল্লা, উদুম, বুদুম, নলি, গৌরি) ফুল ও ফল বছরে ১ বার হয়। বেতের ফুল থেকে ফল পাকা পর্যন্ত ৭ থেকে ৮ মাস সময় লাগে বিধায় একই সাথে গাছে ফুল ও পরিপক্ক ফল দেখা যায়
- পাকা ফলের রং শুকনো খড়ের মত। সাধারণত ফলের বহিরাবরণের নরম অংশ ছাড়িয়ে বীজ বপন করতে হয়। অন্যথায় ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও পোকা-মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়
- এমনি অথবা ছাই মিশিয়ে চটকিয়ে ফলের বহিরাবরণ ও নরম অংশ সহজেই সরিয়ে ফেলা যায়
- সাধারণত বেশি পরিমাণ বীজের খোসাসহ নরম অংশ পরিষ্কার করতে প্রচুর সময় লাগে বিধায় সম্পূর্ণ বেতের ফল পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে বীজের আবরণ নরম হয়। এরপর বেতের ফল চটের বস্তায় ভরে আছড়িয়ে বীজের খোসাসহ নরম অংশ বীজ হতে আলাদা করা যায় ও পানিতে ধুয়ে বীজ পরিষ্কার করা হয়

খ) বীজ সংরক্ষণ

- সম্পূর্ণ ফল বা বীজের বহিরাবরণের নরম অংশ ছাড়িয়ে বীজ সংরক্ষণ করা যায়। খোলা পাত্রে কক্ষ তাপমাত্রায় বীজ রাখলে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়। কিন্তু বীজ ভালভাবে শুকিয়ে মুখবন্ধ পাত্রে ঘরের তুলনামূলক ঠান্ডা জায়গায় রাখলে ৩-৪ মাস সংরক্ষণ করা যায়
- দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা হয়
- তবে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করলে এর অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে লোপ পায়

গ) বীজতলা তৈরি ও বীজ বপন

- বীজতলা তৈরির জন্য মাটি খুব ভালভাবে আলগা করে এর সাথে পরিমাণ মত মাটি ও গোবর সার ৩:১ মিশিয়ে দিন
- বীজ সংগ্রহের ১০-১৫ দিনের মধ্যে বীজ বপন করা উত্তম
- বীজতলা ছাড়াও মাটির টব, কাঠের বাক্স, ট্রে অথবা সরাসরি মাটিভর্তি চারা উত্তোলন পাত্রে বীজ বপন করা যায়
- বীজ বপনের পূর্বে ২ দিন পানিতে ভিজিয়ে রেখে অথবা বীজ সরাসরি শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘসে অথবা ৩ থেকে ৫ মিনিট এসিডে (৫% মাত্রার সালফিউরিক এসিড) ভিজিয়ে তারপর ধুয়ে রোপণ করলে অঙ্কুরোদগমের হার বৃদ্ধি পায়। বীজ বপনের জন্য দো-আঁশ মাটি ও গোবরের মিশ্রণ ৩ঃ১ অনুপাতে হওয়া বাঞ্চনীয়
- বীজতলা তৈরির পর ছাই মাখানো বীজগুলো বীজতলায় ছড়িয়ে দিয়ে বীজের উপরে দুই সেন্টিমিটার পুরু ঝুরঝুরে মাটি ছিটিয়ে দিতে হবে
- ভিজা কাঠের ভুষি অথবা বালি ও কাঠের ভুষি (১:১) মিশ্রণ করে বীজ উত্তোলন পাত্রে ভরে বীজ রোপণ করলে বেশি সংখ্যক বীজ অঙ্কুরিত হয়। বীজ লাগানোর পর বীজ ভিজা রাখার জন্য প্রতিদিন ভোরে বীজতলায় হালকাভাবে পানি দিন
- বৃষ্টির দিনে বীজতলায় বৃষ্টির ফোটা পড়ার ফলে অনেক সময় মাটি সরে বীজ বের হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে ঝুরঝুরা মাটি বীজতলার উপর হালকাভাবে ছিটিয়ে দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে

ঘ) অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা

জালি বেত সাধারণত রোপণের ২০-২১ দিন পর হতে অঙ্কুরিত হতে শুরু করে। অন্যান্য প্রজাতির বেতের বীজ অঙ্কুরিত হতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে। অঙ্কুরোদগমের শতকরা হার প্রজাতি ভেদে ৪৫-৭০ ভাগ।

চারা স্থানান্তর

- বীজতলায় বেতের বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার ১ থেকে ২ মাসের মধ্যে অথবা দুটি পাতা সম্পূর্ণভাবে বের হলে অথবা চারা ৪ থেকে ৫ সেন্টিমিটার লম্বা হলে মাটি ও গোবরের (৩ঃ১) মিশ্রণ ভর্তি ১৫ সে:মি: x ২৫ সে.মি. সাইজের চারা উত্তোলন পাত্রে স্থানান্তর করতে হয়
- উত্তোলিত পাত্রের চারা এক বছর নার্সারিতে রাখার পর মাঠে রোপণের উপযুক্ত হয়

বেত বাগান সৃজন ও পরিচর্যা

ক) রোপণ পদ্ধতি

- রোপণের জন্য চিহ্নিত স্থানে ৩০ সে:মি: x ৩০ সে:মি: x ৩০ সে:মি: আকারের গর্ত করে বেতের চারা রোপণ করা হয়
- বেতের চারা রোপণের দূরত্ব ২ মিটার x ২ মিটার
- জীবন্ত বেড়ার (Live fencing) ক্ষেত্রে সাধারণত আরও কম দূরত্বে রোপণ করা হয়। যত কম দুরতে হয় তত তাড়াতাড়ি ইহা বেড়া হিসেবে কাজ করে
- বনজ বৃক্ষের সাথী ফসল হিসেবে দুটি বৃক্ষের মাঝে বেতের চারা রোপণ করা যেতে পারে
- বর্ষাকাল চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। রোপণের মাদা তৈরির ৩-৫ দিন পরে চারা লাগানো হয়
- বেত আরোহী উদ্ভিদ বিধায় অবলম্বনের জন্য বেতের চারা রোপণের সময় এর সাথে দ্রুত বর্ধনশীল বৃক্ষ (যেমন- মান্দার, শিমূল, কড়ই, হাইব্রিড একাশিয়া, আকাশমনি ইত্যাদি) রোপণ করা ভাল
- পূর্বের উত্তোলিত বনজ বাগানের (সেগুন, চম্পা, জারুল, মেহগনি ইত্যাদি) সাথে সাথি ফসল হিসেবে বেতের চারা রোপণ করা যায়

খ) পরিচর্যা

বেতের চারা মাঠে লাগানোর পর চারার পরিচর্যা করতে হবে।

- রোপণের প্রাথমিক অবস্থায় ১-২ বছর গবাদি পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন
- বেত মাঠে লাগানোর পর ৩ বছর পর্যন্ত বছরে ২ বার আগাছা পরিষ্কার করে গোড়ার মাটি আলগা করে দিলে বৃদ্ধি ভাল হয়
- বেতের প্রতিকূল আবহাওয়া সহ্য করার ক্ষমতা খুব বেশি এবং সাধারণত এর কোন কান্ড ছিদ্রকারী পোকা নাই
- বেতের আরোহী শুঁড় বের হলে এর কান্ডকে বেড়ে ওঠার জন্য সহায়ক বৃক্ষের প্রয়োজন। এতে বেতের কান্ড দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ কারণে বনজ বৃক্ষের সাথে সাথি ফসল হিসেবে চাষ করাই উত্তম

পরিপক্ক বেত সংগ্রহ

নিয়মিত পরিচর্যা করলে জাত ভেদে ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে প্রতি ঝাড় হতে বেত আহরণ করা যায় এবং পরবর্তীতে প্রতি বছর এর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বেত একবার রোপণ করে সামান্য পরিচর্যা করলে প্রতিষ্ঠিত ঝাড় থেকে ২০ হতে ২৫ বছর পর্যন্ত প্রতি বছর বেত সংগ্রহ করা যায়।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

এক একর জমিতে ৩ মি. x ৩ মি. দুরত্বে ৪৫০ টি বেতের চারা লাগানো যায়। ৫ থেকে ১০ বছর পর বেতের ১টি ঝাড় থেকে কম পক্ষে ২টি করে বেত (জাত ভেদে ১০ থেকে ৪০ মি. লম্বা) কাটলে মোট সাড়ে ৮ শত বেত পাওয়া যায়। একটি বেত গড়ে ৩০ টাকা দরে বিক্রি করলে প্রথম বছরেই প্রতি একরে ২৫ হাজার টাকা মূল্য পাওয়া সম্ভব। এভাবে প্রতি বছর বেতের উৎপাদন এবং আয় বাড়তে থাকে।

বেত রোপণ একবার আহরণ বারবার

পাটিপাতার চাষ পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ভূমিকা

গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে পরিচিত এবং সমাদৃত একটি নাম শীতল পাটি যা, পাটিপাতা নামক গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের কান্ডের বাহিরের আবরণ দিয়ে তৈরী করা হয়। সেই প্রাকৃতিক সম্পদ পাটিপাতা বিস্ফোরিত জনসংখ্যার চাপ এবং অপরিকল্পিত আহরণের ফলে আজ বিলুপ্তির পথে।

পাটিপাতা নির্ভর কুটির শিল্প আজ ধ্বংসের পথে এবং তৎসংগে সম্পৃক্ত গ্রামগঞ্জের কারু শিল্পীরাও বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। বিলুপ্তির পথে ধাবিত এই প্রাকৃতিক সম্পদ ও গ্রাম বাংলার কারু শিল্পীদের কাজের ক্ষেত্র অব্যাহত রাখার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটি এর গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক সহজ উপায়ে পাটিপাতা উদ্ভিদের চাষাবাদ পদ্ধতি এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গবেষণালব্ধ ফলাফল উদ্যোগী চাষীদের অনুপ্রেরণা যোগাবে।

অঞ্চল ভেদে পাটিপাতা বিভিন্ন নামে পরিচিত। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এর নাম পাটিপাতা এবং পাটির জাং, নোয়াখালিতে মস্তাক, সিলেট-টাংগাইলে পাটিবেত, মূর্তা এবং বরিশালে পাইত্রা বন নামে পরিচিত। এই গাছ Marantaceae গোত্রের একটি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম *Schumannianthus dichotoma.* এর কান্ড নলাকার মসৃণ। কচি অবস্থায় গাঢ় সবুজ হতে অনেকটা কালো রং এর হয় এবং প্রাপ্ত বয়সে হালকা হলুদাভ সবুজ বর্ণ ধারণ করে। অংকুর মাটি ভেদ করে লম্বাভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দুই হতে চার হাত লম্বা হওয়ার পর অগ্রভাগে একটি গিঁট বা পর্বের সৃষ্টি হয়। অতঃপর ইহা ভেদ করে প্রধান কান্ড বৃদ্ধি পেতে থাকে ও শাখা প্রশাখা বিভক্ত হয়। প্রধান কান্ড এবং শাখা প্রশাখা কচি অবস্থায় গোড়ার দিকে এক প্রকার আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে যা পরে ঝরে যায়।

ব্যবহার

পাটিপাতা কুটির শিল্পে ব্যবহৃত এক মূল্যবান অর্থকরী উদ্ভিদ। গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে শীতল পাটির নাম সবারই জানা। এককালে উন্নতমানের শীতল পাটির কাঁচামালই ছিল পাটিপাতা। শীতল পাটি ছাড়াও এ পাটিপাতা হতে বেশ কয়েক ধরনের ছোট বড় দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করা যায়। বাড়ীর চারপাশে পাটিপাতার চাষ বেড়া হিসাবেও কাজ করে। মুদি দোকানে জিনিসপত্র বাঁধার জন্যও ইহা ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তিগত অফিস, ড্রইংরুম, বিশেষ বিশেষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শো রুম এবং সভা মজলিসের ডেকোরেশন ছাড়াও বহির্বিশ্বে এর কদর প্রচুর।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বাংলাদেশের পরিবেশ ও অর্থনীতিতে পাটিপাতা ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম। ইহা একটি অত্যন্ত মূল্যবান অর্থকরী উদ্ভিদ। এককালে এ উদ্ভিদ হতে তৈরি শীতল পাটি এবং অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করে গ্রামের সাধারণ মানুষেরা জীবিকা নির্বাহ করত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের চাষাবাদযোগ্য জমি হ্রাস পাওয়ায় পাটিপাতার চাষ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ফলে ইহার উৎপাদনও হ্রাস পায়।

পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামালের অভাবে পাটিপাতার উপর নির্ভরশীল কুটির শিল্পগুলি অনেকটা বিলুপ্তির পথে। আর এই শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিরাও অনেকেই বেকার।

আমাদের দেশ কৃষি প্রধান। তাই গ্রামের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উন্নতমানের কৃষি ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত কুটির শিল্প স্থাপন। গ্রামে অবস্থিত পাটিপাতার উপর নির্ভরশীল কুটির শিল্পগুলি এখন ধ্বংসের পথে। অথচ পাটিপাতার তৈরি জনপ্রিয় শীতল পাটি এবং অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা আমোদের দেশে প্রচুর। আন্তর্জাতিক বাজারেও ইহার ব্যাপক চাহিদা বিদ্যমান। পাটিপাতার অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান এবং ইহার চাষের সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবই পাটিপাতা বিলুপ্তির অন্যতম কারণ।

আমাদের দেশের মত উন্নয়নশীল দেশে ধান, পাট, গম ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের তুলনায় পাটিপাতার চাষ অত্যন্ত সহজ ও লাভজনক। চারা লাগানোর পর থেকে কাটা পর্যন্ত তেমন কোন পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। যে কোন নীচু এলাকার অনাবাদি জমিতে পাটিপাতার চাষ সম্ভব। এমনকি বাড়ীর আশেপাশের পতিত জমিতেও ইহার চাষ লাভজনক। পাটিপাতার চারা জমিতে লাগানোর ২/৩ বৎসর পর প্রথমবার কাটা সম্ভব। চার ডেসিমেলের পাটিপাতার বাগান হতে প্রথমবার কাটার সময় কমপক্ষে দুই হাজার টাকার পাটিপাতা বিক্রি সম্ভব। এরপর প্রতি এক বছর অন্তর অন্তর একই পরিমাণ ভুমি হতে ক্রমান্বয়ে পাটিপাতার বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি পায়। (তথ্য সংগ্রহ ঃ ক্যাপটেন (অবঃ) নুরুল হক ভুইয়া বীর প্রতীক, মিরসরাই, চট্টগ্রাম। জনাব হক পাটিপাতার বাণিজ্যিক ভিত্তিক চাষে নিয়োজিত)।

বাংলাদেশের পরিবেশ ও অর্থনীতিতে এ উদ্ভিদ ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এ উদ্ভিদ হতে তৈরি জিনিস গুণগত মানের উপর ভিত্তি করে এর মূল্যমান পঞ্চাশ টাকা হতে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত উঠানামা করে। পাটিপাতা চাষে প্রথমবারের মত খরচ হয় একর প্রতি ৫-৬ হাজার টাকা। এরপর প্রতি বছর শুধু পরিচর্যার জন্য খরচ হবে মাত্র আনুমানিক এক হাজার টাকা। পাটিপাতা লাগানোর প্রথম ৩-৪ বছর কোন উৎপাদন পাওয়া না গেলেও পরবর্তী দশ বছরের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব থেকে দেখা যায়- পাটিপাতার উৎপাদন আয় ধান অপেক্ষা একর প্রতি ২০-৩০ হাজার টাকা বেশি।

চাষ পদ্ধতি

যে জমি অন্য কোন অর্থকরী শস্য (ধান, পাট ইত্যাদি) চাষের উপযোগী নয় সেখানেই পাটিপাতার চাষ শুরু করা যায়। পাটিপাতা চাষাবাদের জন্য তিন ধরনের বংশ বিস্তার সামগ্রী যেমন মোথা বা মুড়া, ডালের কাটা অংশ এবং বীজ ব্যবহার করা যায়।

যেহেতু পাটিপাতা নামক উদ্ভিদ আজ বিলুপ্তির পথে, তাই বংশ বিস্তার সামগ্রী মোথা বা ডাল কাটিং ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ সহজ উপায়ে বীজ থেকে চারা উত্তোলন সম্ভব কি না এর উপর গবেষণা শুরু করে এবং সাফল্যের সাথে বীজ থেকে চারা উত্তোলন করতে সমর্থ হয়েছে। গবেষণা কাজে দেখা যায় যে বীজ থেকে চারা উত্তোলন খুবই সহজ এবং অংকুরোদগমের হারও সন্তোষজনক। চারা এক বৎসর বীজতলাতে রেখে পরে লাগাতে হয়।

চাষ সম্প্রসারণ

১। বীজ

২। মোথা বা মুড়া

৩। ডাল কাটা অংশ

বীজ থেকে চাষ সম্প্রসারণ

বীজের মাধ্যমে পাটিপাতা চাষাবাদের জন্য আটটি পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হয়। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে এ পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে হবে তার কোন বাধা ধরা নিয়ম নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে এ পদক্ষেপগুলি সংখ্যায় কম বা বেশী হতে পারে।

(ক) বীজ সংগ্রহ ঃ বছরের মাঘ-ফাল্গুন মাসে পাটিপাতা উদ্ভিদে ফুল হয়। চৈত্র-বৈশাখে পাটিপাতার ফল/ বীজ সংগ্রহ করা হয়। একটি ফলের ভিতরে দুই বা তিনটি বীজ থাকে।

(খ) বীজ সংক্ষরণ ঃ পাকা ফল সংগ্রহ করে আস্ত ফল হতে বীজ বের করে শুস্ক পাত্রে কম তাপমাত্রায় আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা যায়। তবে আস্ত ফল সংরক্ষণ করাই উত্তম। কারণ আবরণবিহীন বীজ অপেক্ষা ফলের ভিতরে অবস্থিত বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা বেশি থাকে। পাকা ফল/ বীজ বেশি দিন সংরক্ষণের জন্য ছত্রাকনাশক ঔষধ ব্যবহার করা ভাল, অন্যথায় ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়।

(গ) বীজ তলা তৈরি ঃ বীজ বপনের জন্য তিনভাগ দো-আঁশ মাটি ও একভাগ গোবরের মিশ্রণে বীজতলা তৈরি করা বাঞ্চনীয়। তবে শুধু ভিজা কাঠের ভূষি অথবা সমপরিমাণ ভিজা ভূষি ও বালির মিশ্রণেও বীজতলা তৈরি করা যায়। বীজতলা ছাড়া মাটির পাত্র, পলিথিন ব্যাগ, কাঠের বাক্স ইত্যাদিতেও বীজ বপন করা যায়।

(ঘ) বীজ বপন ঃ পাটিপাতার পাকা ফল সংগ্রহের কয়েকদিনের মধ্যেই ফল বীজতলাতে লাগানো হয়। বীজতলাতে ফল লাগানোর ২০/২৫ দিনের ভেতরেই চারা গজাতে শুরু করে এবং এক হতে দেড় মাস সময় পর্যন্ত চারা গজাতে থাকে। চারা এক বছর বীজতলায় রেখে পরে রোপণ করতে হয়।

(ঙ) চারা পলিব্যাগে স্থানান্তর ঃ পাটিপাতার চারা গজানোর পর ৩ঃ১ মাটি ও গোবরের মিশ্রণ ৬" x ৯" মাপের পলিব্যাগ ভর্তি করে চারা স্থানান্তর করতে হয়। একটি ফল থেকে দুই/তিনটি চারা বের হয়। পলিব্যাগে চারা রোপণের সময় এগুলো আলাদা করে নিতে হয়।

(চ) চারা শক্ত করণ ঃ চারা শক্ত করণের জন্য পলিব্যাগে স্থানান্তর করে এক বছর রাখতে হয়। এ সময় সামান্য ইউরিয়া সার পানির সাথে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিলে চারা সতেজ, সজীব ও পুষ্ট হয়।

(ছ) ক্ষেত্র তৈরি করণ ঃ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক মাস পাটিপাতা চাষের উপযুক্ত সময়। খাল, বিল, ডোবা, জলাশয়ের ধার, বাড়ীর আশেপাশের পরিত্যক্ত নিচু জমি যেখানে সাধারণতঃ অন্যকোন অর্থকরী ফসল জন্মে না, আগাছা পরিস্কার করে সেই সমস্ত জমির মাটি সামান্য কর্ষণের মাধ্যমে পাটিপাতার চারা লাগানোর জন্য ক্ষেত্র তৈরি করা হয়।

(জ) চারা লাগানো ঃ পাটিপাতার বীজ থেকে উত্তোলিত চারা পলিব্যাগে এক বছর রেখে শক্ত করার পর ক্ষেত্র তৈরি করে জমিতে লাগানো হয়। চারা জমিতে লাগানোর পর গোড়া শক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি চারা একটা খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হয়।

মোথা বা মুড়া থেকে চাষ সম্প্রসারণ

দেশীয় পদ্ধতিতে অধিকাংশ এলাকায় মোথা বা মুড়া থেকে পাটিপাতার চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। কিন্তু পাটিপাতা বিলুপ্তির কারণে এই মোথা বা মুড়া দুর্লভ হয়ে উঠেছে। নিম্নলিখিত পদক্ষেপের মাধ্যমে মোথা বা মুড়া থেকে পাটিপাতার চাষাবাদ করা হয়ে থাকে।

(ক) ক্ষেত্র তৈরি করণ ঃ পাটিপাতা চাষের জন্য এমন কিছু জমির প্রয়োজন যেখানে অন্য কোন অর্থকরী ফসলের চাষ করা যায়না যেমন-হাজামজা পুকুরের ধার, ডোবা, জলাশয়ের ধার, কুয়ার ও খালের কিনারা প্রভৃতি পরিত্যক্ত জমিতে যেখানে প্রায়ই পানি জমে থাকে এবং শুকনো মৌসুমেও মাটি ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে থাকে। আগাছা পরিস্কারের পর মাটি সামান্য কর্ষণের মাধ্যমে ক্ষেত্র তৈরি করা হয়।

(খ) মোথা বা মুড়া সংগ্রহ ঃ সাধারণতঃ চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং কার্তিক মাস পাটিপাতা চাষের উপযুক্ত মৌসুম। আর চৈত্র, বৈশাখে সাধারণতঃ পাটিপাতা কাটতে হয়। এ সময়ই পাটিপাতা চাষের জন্য মোথা বা মুড়া সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

(গ) মোথা বা মুড়া লাগান ঃ চৈত্র, বৈশাখ মাসে মোথা বা মুড়া সংগ্রহের পর চাষের জন্য তৈরিকৃত জমিতে সারিবদ্ধভাবে ২ ফুট (০.৬১ মিটার) অন্তর অন্তর মোথা বা মুড়া লাগানো হয়। এক সারি থেকে আর এক সারির ব্যবধানও ২ ফুট (০.৬১ মিটার) হওয়া প্রয়োজন।

ডালের কাটা অংশ থেকে চাষ সম্প্রসারণ

ডালের কাটা অংশ থেকেও পাটিপাতার চাষাবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহার বিলুপ্তির কারণে ডালের কাটা অংশও দুর্লভ হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে ডালের কাটা অংশ থেকে পাটিপাতার চাষাবাদ করা যায়।

ক) ক্ষেত্র তৈরি করণ ঃ পাটিপাতা চাষাবাদের জন্য তেমন কোন ভাল জমির প্রয়োজন হয় না। বাড়ির চারপাশে পরিত্যক্ত জমি, ডোবা, নালা, খাল-বিলের কিনারা ইত্যাদি জায়গায় যা সব সময় ভিজা বা স্যাঁতস্যাঁতে থাকে সামান্য কর্ষণের মাধ্যমে এই পরিত্যক্ত জমিগুলোকে পাটিপাতা লাগানোর উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে তৈরি করা যায়।

খ) ডালের কাটা অংশ সংগ্রহ ঃ পাটিপাতার মোথা বা মুড়ার মত ডালের কাটা অংশও চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক মাসে সংগ্রহ করা হয়। কারণ এসময়ই পাটিপাতা চাষের উপযুক্ত মৌসুম।

গ) ডালের কাটা অংশ লাগানো ঃ বর্ষাকালে পাটিপাতা থেকে ধারালো ছুরি দিয়ে গিঁট/পর্বসহ ২ ফুট থেকে ৩ ফুট পরিমান ডাল কাটা হয়। অত:পর তৈরিকৃত ক্ষেত্রে সারিবদ্ধভাবে ২ ফুট অন্তর অন্তর এগুলো লাগানো হয়। এক সারি থেকে আরেক সারির দুরত্ব ২ ফুট বা ০.৬১ মিটার হওয়া বাঞ্চনীয়।

পরিচর্যা

সাধারণত: ডালের কাটা অংশ জমিতে লাগানোর এক-দু মাস পর প্রতিটি গাছের গোড়ায় সামান্য মাটি তুলে দিতে হয়। তাছাড়া পাটিপাতার বাগান স্থাপিত হওয়ার পর বছরে দুবার আগাছা পরিস্কার করা, গোড়ার মাটি কিছুটা হালকা করা এবং গোড়ায় কিছুটা কাদামাটি দেয়া ভাল। প্রতি বৎসর পরিমাণ মত গোবর সার এবং ইউরিয়া ফসফেট সারের মিশ্রণ প্রয়োগ উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাটিপাতায় এখনও তেমন কোন রোগের লক্ষণ দেখা যায়নি, তবে এক ধরনের আরোহী উদ্ভিদ পাটিপাতার বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। সময়মত এ আরোহী উদ্ভিদ পাটিপাতার বাগান থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত।

সংগ্রহ

মোথা বা মুড়া লাগানোর প্রায় দু বছর পর ইহা কাটার জন্য উপযুক্ত হয়। কিন্তু বীজ বা কাটিং থেকে সৃষ্ট পাটিপাতা কাটার জন্য উপযুক্ত হয় তিন বছর পর। সাধারণতঃ চৈত্র বৈশাখ মাসে পাটিপাতা কাটতে হয়। অত্যন্ত ধারালো ছুরি দিয়ে মাটি হতে প্রায় ৩ সে.মি. থেকে ৮ সে.মি. অর্থাৎ প্রায় ১" হতে ৩" উপরে ইহা কাটা হয়। পাটিপাতা প্রথম কাটার সময় মোট কান্ড বা কলম এর এক তৃতীয়াংশ কাটা সম্ভব।

পাটিপাতা সংগ্রহের পর পরই বেত উঠানো উচিত। যদিও সংগহের পর কিছু দিন জমা রেখে পুনরায় ভিজিয়ে বেত উঠানো সম্ভব। বেত উঠানোর পর পর যেমন দ্রব্য সামগ্রী বানানো যায় ঠিক তেমনি প্রয়োজন মত নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংরক্ষণ করাও সম্ভব। বরিশাল অঞ্চলে বেত উঠানোর পর ভাতের মন্ড বা মাড়ের সাথে সিদ্ধ করে পরে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। এর পরে প্রয়োজন মত দ্রব্য সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

উপসংহার

পরিশেষে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যদি আমাদের দেশের মানুষকে পাটিপাতা চাষে উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে বাংলাদেশের পতিত ও অকেজো নিচু জমি অনাবাদি থাকবে না এবং ভুমিহীন কৃষক যাদের সম্বল শুধু বাসতভিটা, তারাও বাড়ীর চারিপাশে পতিত জায়গায় পরিকল্পিতভাবে পাটিপাতার চাষ করে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা অনেকটা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে। একই সাথে পাটিপাতার মত একটি মূল্যবান সম্পদকেও বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

বাড়ীর চারপাশে পাটিপাতার চাষ আর্থিক সুবিধা দানের সাথে সাথে মাটির ক্ষয়রোধে এবং বেড়ার কাজ করতেও সক্ষম। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পাটিপাতার চাষ গ্রামীণ তথা বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে।

ভেষজ উদ্ভিদের ক্ষুদ্র বীজ হতে চারা উত্তোলন পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা

- তুলসী, কালোমেঘ, অশ্বগন্ধাসহ অনেক ভেষজ উদ্ভিদের বীজ অতি ক্ষুদ্র।
- এসব উদ্ভিদের বীজ থেকে চারা উত্তোলন বেশ কষ্টসাধ্য।
- আপনি কি এসব ভেষজ উদ্ভিদের অতি ক্ষুদ্র বীজ হতে সফলভাবে চারা উত্তোলন করতে চান ?
- পাত্রে বীজ বপন পদ্ধতিতে সহজে এসব উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করা সম্ভব।
- পাত্রে বীজ বপন ও চারা উত্তোলন পদ্ধতিতে আপনি সুস্থ, সবল ও সতেজ চারা পেতে পারেন।
- পাত্রে বীজ বপন পদ্ধতি সহজ ও অধিক লাভজনক।

সুগার প্লান্ট (চিনিপাতা)

ভূমিকা

আমাদের দেশে ভেষজ উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ যেমন কান্ড, বাকল, পাতা, ফুল, ফল, বীজ ও মূল, ক্ষেত্র বিশেষে বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের সকল অংশই ঔষধ হিসাবে বিভিন্ন রোগে ব্যবহার হয়ে আসছে। ভেষজ উদ্ভিদের মধ্যে বেশ কিছু উদ্ভিদ রয়েছে যাদের বীজ অতি ক্ষুদ্র যেমন তুলসী, কালোমেঘ, অশ্বগন্ধা, সুগারপ্যান্ট, আপাং ইত্যাদি। এ সব উদ্ভিদের বীজ ক্ষুদ্র হওয়ায় চারা উত্তোলন অনেক সময় ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য।

তবে পাত্রে বীজ বপন করে চারা উত্তোলন পদ্ধতিতে কম খরচে, অল্প সময়ে, স্বল্প পরিমাণ বীজ দিয়ে অধিক সংখ্যক সুস্থ, সবল ও সতেজ চারা উৎপাদন করা সম্ভব।

প্রচলিত পদ্ধতি

প্রচলিত পদ্ধতিতে সাধারণত প্রস্থে ১.২ মি. ও প্রয়োজনে ৩.০-১২.০ মি. পর্যন্ত দীর্ঘ বীজতলায় বীজ বপন করা হয়। বীজতলার স্থান অপেক্ষাকৃত উঁচু ও আলো-বাতাসযুক্ত স্থানে হওয়া ভালো। বীজতলার মাটি খুব ভালভাবে কুপিয়ে এর সাথে পরিমাণমত পুরাতন গোবর সার (মাটি ৩ ভাগ, গোবর ১ ভাগ) মিশিয়ে নিতে হবে। মাটি ও গোবর সারের ঢেলা ও টুকরা গুঁড়ো করে বীজতলাটি মসৃণ করে বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে। বীজতলায় ক্ষুদ্র বীজ সরাসরি বপন করলে বিভিন্ন ছত্রাক ও পতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এই পদ্ধতিতে চারা উত্তোলনের জন্য মূল্যবান বীজের পরিমাণ প্রয়োজন হয় বেশি। আবার বীজ অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় বীজতলায় পানি সেচের সময় বীজ এক সাথে জমা হয়ে গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ক্ষুদ্র বীজ হতে সরাসরি বীজতলায় চারা উত্তোলন ঝুঁকিপূর্ণ ও অলাভজনক।

তাই আমরা ক্ষুদ্র বীজ বীজতলায় সরাসরি বপন না করে পাত্রে বপন করতে পারি। এ পদ্ধতি অধিকতর লাভজনক ও বীজ-সাশ্রয়ী।

পাত্রে ক্ষুদ্র বীজ বপন পদ্ধতি

অতি ক্ষুদ্র বীজের ক্ষেত্রে বীজতলায় সরাসরি বপন না করে মাটির টব, কাঠের বাক্স অথবা ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিকের পাত্রে নিচের পদ্ধতিতে বীজ বপন করতে পারি।

ক) মাটি ও গোবর সার সংগ্রহ এবং পরিশোধন

অশ্বগন্ধার বীজ

- প্রয়োজন মত জমির উপরিভাগের উর্বর মাটি ও কমপক্ষে ৩ মাসের পুরাতন গোবর সংগ্রহ করুন।
- ৩ ভাগ মাটি ও ১ ভাগ গোবর সার মিশিয়ে ভালভাবে গুঁড়ো করে রোদে ভালভাবে শুকিয়ে চালুনি দিয়ে চেলে নিন।
- একটি পাত্রে মাটি ও গোবরের মিশ্রণটি উত্তপ্ত করে পরিশোধিত করুন।

খ) বীজ বপনের জন্য পাত্র প্রস্তুতকরণ

- বীজ বপন ও চারা উত্তোলনের জন্য ২৫-৩৫ সে.মি. ব্যাসের অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমাপের ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিকের পাত্র, কাঠের বাক্স অথবা মাটির পাত্র সংগ্রহ করুন।
- ছিদ্রযুক্ত পাত্রের ভিতরের দিকে খবরের কাগজ ছিদ্র করে পাত্রের সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে বিছিয়ে দিন ।
- পরিশোধিত মাটি ও গোবর সারের গুঁড়ো করা মিশ্রণ দ্বারা পাত্রটি ভর্তি করে নিন এবং পাত্রের সার মিশ্রিত মাটির উপরিভাগ একটা চেপ্টা কাঠি দ্বারা সমান করে দিন।

গ) পাত্রে বীজ বপন

- রোগমুক্ত মাতৃ উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত সুস্থ সবল বীজ বপন করুন।
- তিন আঙ্গুলের ১ চিমটি (০.৫ গ্রাম) বীজ প্রয়োজনমত পরিশোধিত মিহি মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে ভর্তিকৃত মাটি ও গোবরের মিশ্রণের উপরিভাগে সমানভাবে ছিটিয়ে দিন।
- তারপর পরিশোধিত মিহি মাটি ছিটিয়ে ছিটানো বীজের উপরিভাগ হালকাভাবে ঢেকে দিন।

ঘ) বীজ বপনকৃত পাত্রে পানি সেচ

- চারা উত্তোলন পাত্রে পানি ঝরনা দিয়ে না ছিটিয়ে পাত্রটি ভিজিয়ে পানি সরবরাহ করতে হবে। এতে সহজে মাটি পানি শোষণ করে নেয়।
- এ জন্য প্রয়োজন একটি প্লাস্টিকের বড় গামলা, যার ভেতর চারা উত্তোলন পাত্রটি সহজেই বসানো যায়।
- বড় গামলাটির মধ্যে পানি ভরে ছত্রাকনাশক ডায়াথিন এম-৪৫ পাউডার ২০ গ্রাম পরিমাণ প্রতি ১০ লিটার পানিতে গুলিয়ে দিন।
- বপনকৃত বীজের পাত্রটি পানি ভর্তি গামলার মধ্যে এমনভাবে বসিয়ে দিন যাতে গামলার উপরের অংশ পানিতে ডুবে না যায়।
- বীজ বপনকৃত পাত্রের মাটি পুরোপুরি ভেজা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

- বীজের পাত্রটি পুরোপুরি ভেজার পর গামলা হতে উঠিয়ে পাত্রের উপরিভাগের খোলা অংশ পলিথিন দিয়ে ভালভাবে ঢেকে পাত্রটি সরাসরি সূর্যের আলোতে না রেখে মুক্ত আলো বাতাসে রাখুন।
- প্রতিদিন খেয়াল রাখতে হবে, বপনকৃত পাত্রের মাটি যেন শুকিয়ে না যায়। প্রয়োজনে পূর্বের ন্যায় একই পদ্ধতিতে পাত্রের মাটি ভিজিয়ে দিন।
- বীজের পাত্রটি গামলা ভর্তি পানিতে ভিজিয়ে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনক্রমেই বপনকৃত বীজের পাত্রের মাটির উপরিভাগ ফেটে না যায়।

পাত্রে বপনকৃত বীজের অঙ্কুরোদগম

- বীজ বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে চারা গজাতে শুরু করে।
- সাধারণত অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ।

ব্যাগে চারা স্থানান্তর ও পরিচর্যা

- ৮-১০ দিন বয়সের ৪ পাতাযুক্ত চারা মাটি ভর্তি ব্যাগে স্থানান্তর করুন।
- ব্যাগে চারা স্থানান্তর করার পূর্বে ৩ঃ১ অনুপাতে মাটি ও গোবর সার ভালভাবে মিশিয়ে ব্যাগ ভরে নিন।
- চারা উত্তোলন ব্যাগসমূহ সাধারণত প্রস্থে ১.২০ মি. এবং দৈর্ঘ্যে প্রয়োজনে ৩.০-১২.০ মি. পর্যন্ত বীজতলার বেডে সাজিয়ে রাখা যায়।
- বীজ বপনের পাত্র থেকে চিকন বাঁশের কাঠি দিয়ে সতর্কতার সাথে চারা উঠিয়ে ব্যাগে রোপণ করুন।
- চারাগুলো শক্ত করার জন্য রোপণকৃত পাত্রগুলো ৫-৭ দিন ছায়াতে রাখুন। তারপর রোদে রাখা যাবে।
- নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করাসহ বেডের চারা ঝরনা দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- চারা ব্যাগে স্থানান্তর করার পর জাতভেদে বিভিন্ন বয়সে চারা মাঠে রোপণের উপযুক্ত হয়।

ভেষজ উদ্ভিদ শিমুল এর চাষ পদ্ধতি ও ব্যবহার

- আপনি কি শিমুল বৃক্ষের ঔষধি গুণের সাথে পরিচিত ?
- ৭-৮ মাস বয়সের শিমুলের কঁচি মূল ঔষধি গুণে সমৃদ্ধ হওয়ায় দেশের ঔষধ শিল্পে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে।
- প্রধান ফসলের পাশাপাশি শিমূলের চাষ করে কঁচি মূল ঔষধ শিল্পে সরবরাহের মাধ্যমে আপনি আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন।

শিমুল

পরিচিতি

বাংলাদেশের সর্বত্র শিমুল জন্মে। এটি একটি মাঝারি উচ্চতার পাতা ঝরা সোজা ও গোলাকার কান্ড বিশিষ্ট বৃক্ষ। প্রধান কান্ডের সাথে ডালপালা বৃত্তাকারে বিস্তৃত। গাছের কান্ডের এবং ডালপালাতে কৌণিক আকৃতির বড় বড় কাঁটা থাকে। বাকল ধুসর বর্ণের এবং বড় গাছের প্রধান কান্ডের গোড়ায় ঠেস মূল গজায়। ফুল বড় আকারের উজ্জল লাল রংয়ের। ফল ক্যাপসুল জাতীয় ও ফলের ভেতরে বীজসহ তুলা থাকে। সাধারণতঃ ৮-১০ বছর বয়সের শিমুল গাছের গড় উচ্চতা ৩৫-৪০ মি. ও বেড় ৩-৪ মি.। শিমুলের বৈজ্ঞানিক নাম *Bombax ceiba.*

ব্যবহার

শিমুল গাছের কান্ডের আঠা ও ৬ থেকে ৭ মাস বয়সের শিমুল গাছের কঁচি মূল ভেষজ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। ডায়েরিয়া, আমাশয়, কাশি ইত্যাদি রোগে শিমুলের আঠা ব্যবহার হয়। কঁচি মূল ও কান্ডের বাকল বলবর্ধক, শুক্রমেহ ও উত্তেজক টনিক হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। রাসায়নিক উপাদান- Catechutannic acid, Stearin, Proteins, Tannins, Lipids ইত্যাদি শিমুল মূলে পাওয়া যায়।

নার্সারিতে চারা উত্তোলন কৌশল

সাধারণত শিমুলের বীজ ও কাটিং দিয়ে বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। তবে চাষাবাদের জন্য বীজ থেকে চারা উৎপাদন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।

ক) বীজ সংগ্রহ

এপ্রিল-মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) মাসে শিমুল গাছের ফল পাকে। এই পরিপক্ক ফল লম্বা বাঁশের সাহায্যে সতেজ, সবল ও রোগমুক্ত গাছ হতে সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত ফল কয়েকদিন খোলা অবস্থায় রোদে রেখে দিলে ফলের খোসা ফেটে বীজসমেত তুলা বাতাসে উড়তে থাকে। এজন্য জাল/পাতলা কাপড় দিয়ে ফাটা ফল ঢেকে বীজ ও তুলা ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। ১ কেজিতে ২৫,০০০-২৭,০০০ টি বীজ পাওয়া যায়।

খ) বীজ সংরক্ষণ

বীজ রোদে ভালভাবে শুকিয়ে ঘরের তুলনামূলক ঠান্ডা জায়গায় মুখবন্ধ পাত্রে রেখে সংরক্ষণ করা যায়। তবে ৬ মাস রাখলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ২০% এর নীচে নেমে আসে।

গ) বীজ বপন

বীজ সংগ্রহের পর ১০-১৫ দিনের মধ্যে বীজ বপন করা উত্তম। সাধারণত ২ পদ্ধতিতে বীজ বপন করা হয়।

বীজ

১) চারা উত্তোলন পাত্রে বীজ বপন

- মাটি ও গোবর সার ৩:১ অনুপাতে মিশিয়ে মিশ্রনটি ছাঁকুনি দিয়ে চেলে চারা উত্তোলন পাত্র ভরতে হবে।
- মাটি ও গোবর সার ভর্তি চারা উত্তোলন পাত্র (সাধারণত ১.২০ মি. প্রস্থে এবং প্রয়োজনে দৈর্ঘ্যে ৩.০-১২.০ মি. পর্যন্ত) বীজতলার বেডে সাজিয়ে রাখতে হবে।
- প্রতিটি চারা উত্তোলন পাত্রে ২-৩ টি বীজ সরাসরি বপন করতে হবে।

চারা উত্তোলন বেড

২) সরাসরি জমিতে বীজ বপন (শুধু মাত্র মূল সংগ্রহের জন্য)

বর্ষার শুরুতে এপ্রিল-মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) মাসে জমি ৩-৪ বার লাঙ্গল দিয়ে ভালভাবে চাষ করে নিতে হবে। জমিতে বিঘা প্রতি ১০-১২ কিলোগ্রাম হারে পাটের বীজের মত ঘন করে শিমুলের বীজ ছিটিয়ে বপন করতে হবে যেন চারাগুলো ঘন হয়। কারণ চারা যত ঘন হবে তত শিমূল মূলের শাখা-প্রশাখা কম হবে এবং প্রধান মূলের বৃদ্ধি ভাল হবে।

ঘ) অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা

- চারা উত্তোলন পাত্রে বীজ বপনের পর ৮-১০ দিনের মধ্যে চারা গজাতে শুরু করে।
- সদ্য সংগৃহীত বীজ চারা উত্তোলণ পাত্রে রোপণ করলে অঙ্কুরোদগমের শতকরা হার ৫০-৭০ ভাগ পাওয়া যায়।
- পাত্রে উত্তোলিত ২-৩ মাস বয়সের চারা মাঠে রোপণের উপযুক্ত হয়।

বাগান সৃজন ও পরিচর্যা (পাত্রে উত্তোলিত চারা দ্বারা)

প্লাবনমুক্ত ভূমির আইল, গাঙ্গেয় উচ্চভূমি, সমতল গড় উচ্চভূমি, পাহাড়িভূমি এবং পাহাড়ের পাদদেশের সমতল উচ্চ ভূমি ইত্যাদি শিমুল বাগান সৃজনের উপযুক্ত স্থান। এছাড়া বসত বাড়ির আশে পাশের জলাবদ্ধতামুক্ত উচু পতিত জমিতে শিমুলের বাগান সৃজন সম্ভব।

ক) রোপণ পদ্ধতি

- বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ মে-জুন (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়) মাসে শিমুলের চাষ করা যায়। এছাড়া বসতবাড়ীর আশে-পাশের অনাবাদি জমিতেও শিমুলের চাষ করা যায়।
- রোপনের জন্য চিহ্নিত জমির আগাছা পরিস্কার করে কুপিয়ে নিতে হবে।
- শিমুল বাগান সৃজনের জন্য ১৮০ সে.মি. x ১৮০ সে.মি. দুরত্বে গর্ত (৩০ সে.মি. x ৩০ সে.মি. x ৩০ সে.মি.) করে সারিবদ্ধভাবে বা লাইনে চারা রোপণ করতে হবে।
- রোপিত চারার গোড়ায় একটি করে লম্বা ও চিকন বাঁশের কাঠি পুতে কাঠির সাথে চারা বেঁধে দিতে হবে।

খ) পরিচর্যা

- প্রয়োজনে মাঝে মাঝে পরিমিত সেচ দিতে হবে।
- জমিতে রোপণের পর বছরে ২ বার আগাছা পরিস্কার করে গোড়ার মাটি আলগা করে দিলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়।
- রোপণের প্রাথমিক অবস্থায় ১-২ বৎসর গবাদি পশুর আক্রমণ হতে রক্ষা করা প্রয়োজন।
- প্রয়োজনে জৈব সার ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফসল সংগ্রহ, শুকানো ও সংরক্ষণ পদ্ধতি (শুধুমাত্র মূল সংগ্রহের জন্য)

- বীজ বপনের ৭-৮ মাসের মধ্যে শীতকালে অর্থাৎ জানুয়ারী-মার্চ (পৌষ-মাঘ) মাসে মূল সংগ্রহ করা হয়।
- ফসল/মূল সংগ্রহের আগের দিন বিকাল বেলা সেচ প্রয়োগ করে মাটি নরম করে নিতে হয়, পরের দিন সকাল বেলা শাবল বা খন্তা দিয়ে সাবধানতার সাথে মাটির গভীর হতে মূল তুলতে হয়।
- প্রধান কান্ডের সামান্য নিচ হতে মূলগুলো কেটে পৃথক করে পানি দিয়ে ধুয়ে পরিস্কার করার পর দা বা সুপারি কাটার যন্ত্র (যাতি) দিয়ে মূলগুলো ছোট ছোট টুকরো করতে হয়।
- সাধারণত শাখাবিহীন সোজা মূলের চাহিদাই বেশি। এ ধরনের মূল নরম হয় ও মূলের উপরের অংশ ধরে টান দিলে অতি সহজেই ভিতরের কেশুরের মত নরম সাদা মূল বের হয়ে আসে যা চিবিয়ে খেলে পিচ্ছিল স্বাদ পাওয়া যায়। এ ধরনের মূলই ফসল পরিপক্ক বা সংগ্রহের সময়কে নির্দেশ করে।
- শিমূলের মূল ধুয়ে পরিস্কার করার পর পরিস্কার মাদুরে বিছিয়ে হালকা রোদে কিংবা বাতাসে শুকাতে হবে।
- মূল শুকানোর পর তা হাতের মুঠোয় নিয়ে চাপ দিলে ভেঙ্গে যাবে এবং পাউডারের মতো সাদা পদার্থ বের হলে বুঝতে হবে মূল সঠিকভাবে শুকানো হয়েছে।
- উলেখ্য যে, ৪-৫ কিলোগ্রাম কাঁচা মূল শুকানোর পর ১ কিলোগ্রাম শুকনো মূল পাওয়া যায়। সংরক্ষণের জন্য শুকনো মূল পরিস্কার চটের বস্তায় রাখতে হয় এবং মাঝে মাঝে রোদে দিতে হবে যাতে মূলে ছত্রাকজনিত আক্রমণ না হয়।

ফলন

সরাসরি জমিতে বীজ বপন করে ৭-৮ মাসের মধ্যে ১ বিঘা জমি থেকে সাধারণত ৫০-৫২ মণ কাঁচা শিমূল মূল পাওয়া যেতে পারে।

বাজারজাত করণ

দেশের বিভিন্ন আর্য়ুবেদিক ও ইউনানী ঔষধ কোম্পানি যেমন সাধনা, শক্তি, কুন্ডেশ্বরী, হামদার্দ ল্যাবরেটরীজ, বিজি ল্যাবরেটরীজ, ফার্মাজেম, মৌভাষা ঔষধালয় গুলোতে শুকনো শিমূল মূলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কোম্পানিগুলো শুকনা মূলের দর নির্ধারণ করেছে ৫০-৬০ টাকা/কিলোগ্রাম এবং স্থানীয় বাজারে কাঁচা মূল ১৫-২০ টাকা/কিলোগ্রাম দরে বিক্রি হয়ে থাকে। তবে কিছু কিছু ঔষধ কোম্পানিতে কাঁচা মূল প্রক্রিয়াজাতকরণের সম্ভবনাও রয়েছে। সেক্ষেত্রে কাঁচা মূলের চাহিদা সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে।

আয়-ব্যয়

(ক) প্রতি বিঘায় উৎপাদন ব্যয় (২০১১ সনের হিসাব অনুযায়ী)

উৎপাদন ব্যয়	পরিমাণ	দর (টাকা)	মূল্য (টাকা)
বীজ	১২ কিলোগ্রাম	৭০	৮৪০
জমি তৈরি/হালচাষ	৪ টি	১৫০	৬০০
গোবর/কম্পোস্ট সার	২০ ভ্যান	৫০	১,০০০
আগাছা পরিস্কার (চারা গজানোর দুই মাস পর)	২ জন	১০০	২০০
সেচ প্রয়োগ	৪ জন	১০০	৪০০
ফসল উত্তোলন	১ বার	১৫০	১৫০
পরিবহন ও অন্যান্য	-		২০০
		মোট	৩,৩৯০

খ) মোট আয়

৭-৮ মাস পর ১ বিঘা জমি হতে প্রায় ২০০০ কিলোগ্রাম কাঁচা মূল অর্থাৎ ৫৬০ কিলোগ্রাম শুকনো মূল পাওয়া যায়। কাঁচা মূল ১৫ টাকা / কেজি এবং শুকনো মূল ৫০ টাকা / কেজি হিসাবে

কাঁচা মূল হতে মোট আয় (২০০০ x ১৫) টাকা

= ৩০০০০ টাকা / বিঘা

শুকনা মূল হতে মোট আয় (৫৬০ x ৫০) টাকা

= ২৮০০০ টাকা / বিঘা

মোট লাভ = মোট আয় - মোট উৎপাদন ব্যয়

কাঁচা মূল হতে মোট লাভ (৩০০০০ - ৩৩৯০) টাকা

= ২৬৬১০ টাকা /বিঘা

শুকনা মূল হতে মোট লাভ (২৮০০০ - ৩৩৯০) টাকা

= ২৪৬১০ টাকা / বিঘা

*** আয়-ব্যয়ের তথ্য ইন্টার কো-অপারেশন, বগুড়ার সহযোগিতায় সরাসরি কৃষকের মাঠ হতে সংগৃহীত।**

ভেষজ উদ্ভিদ বাসক এর চাষ পদ্ধতি ও ব্যবহার

- আপনি জানেন কি বাসক একটি অতি মূল্যবান ঔষধি উদ্ভিদ ?
- বাসকের চাষ সহজ তাই যে কোন অনাবাদি পতিত জমিতে সাথী ফসল হিসাবে চাষ করে অধিক লাভবান হতে পারেন।
- বাসক পাতার রস আমাদের ঠান্ডা জনিত কফ, কাশি ও শ্বাসনালির কষ্টে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে।

বাসক

পরিচিতি

বাসক বহুবর্ষজীবি গুল্ম জাতীয় চির সবুজ ভেষজ উদ্ভিদ। পাতা বল্লমাকার ও এর রং গাঢ় সবুজ। ফুলের রং সাদা, ফল ক্যাপসিউল জাতীয়। বাসক উদ্ভিদটি উচ্চতায় ১ মি. থেকে ১.৫ মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। বাসকের বৈজ্ঞানিক নাম *Adhatoda zeylanica*.

ব্যবহার

বাসকের মূল, পাতা ও বাকল ভেষজ ঔষধ হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। পাতা ও বাকলের রস সব ধরনের কফ, ঠান্ডা ও শ্বাসনালী সংক্রান্ত রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে। তাজা পাতার রস ফুসফুস হতে রক্তক্ষরণ ও রক্তবমি বন্ধে উপকারী। মূল ও পাতার রস আদার রসের সাথে মিশিয়ে খেলে বাতজ্বর, কোষ্ঠকাঠিন্য, কম্পজ্বর ও হাঁপানি সমস্যা দূরীভূত হয়। Vasicine, I-Peganine , Small amount of essential oil নামক রাসায়নিক উপাদানগুলো ভেষজ উদ্ভিদ বাসকে পাওয়া যায়।

নার্সারিতে চারা উত্তোলন কৌশল

বাসকের বংশ বিস্তারে বীজ ও কাটিং ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে বীজ সহজলভ্য নয় এবং বীজ থেকে চারা উত্তোলন কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল হওয়ায় ব্যাপকভাবে চাষাবাদের জন্য কাটিং সহজলভ্য ও সুবিধাজনক।

ক) কাটিং সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন (বীজতলায় অথবা চারা উত্তোলিত পাত্রে)

জুন-জুলাই (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়) মাসে ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা তিনটি গিটসহ বাসকের পরিপক্ক ডাল (২-৩ বৎসর বয়স্ক গাছের) কাটিং হিসাবে সংগ্রহ করতে হবে। সতেজ, সবল ও রোগমুক্ত বাসকের ঝাড় থেকে কাটিং সংগ্রহ করা ভাল। ৩ ঃ ১ অনুপাতে মাটি ও গোবর সারের মিশ্রণ চারা উত্তোলন ব্যাগে ভরে সংগৃহীত কাটিং একটু কাত (৪৫°) করে মাটি ভর্তি ব্যাগে লাগাতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে কাটিং এর একটি গিট যেন মাটির নীচে ও ২টি গিট মাটির উপরে থাকে। ১৫-২১ দিনের মধ্যে রোপিত কাটিং এর গিটে নতুন করে ডাল গজাতে শুরু করে একই সাথে মাটির নীচের অংশেও মূল গজাতে শুরু করে তবে মূলের চেয়ে ডালের বর্ধন প্রায় দ্বিগুণ হয়। এছাড়া সরাসরি বীজতলায় কাটিং রোপণ করে চারা উৎপাদন করা যায়। এ ক্ষেত্রে বীজতলায় ৩ ভাগ বেলে মাটি এবং ১ ভাগ গোবর সার মিশিয়ে বীজতলা ভালভাবে তৈরি করে নিতে হবে। এরপর কাটিং সংগ্রহ করে উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করা যায়।

খ) কাটিং সংরক্ষণ

আমাদের দেশে স্থায়ীভাবে কাটিং সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই তবে কাটিং সতেজ রাখার জন্য পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে ঠান্ডা স্থানে রেখে অস্থায়ীভাবে ১/২ দিন কাটিং সংরক্ষণ করা যায়।

কাটিং

গ) শেকড় গজানোর ক্ষমতা

- পট বা পলিব্যাগে রোপিত কাটিং গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৭০-৮০ ভাগ।
- বীজতলায় রোপিত কাটিং গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ।
- সরাসরি জমিতে কাটিং রোপণের ক্ষেত্রে শেকড় গজানোর ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম।

বাগান সৃজন ও পরিচর্যা

ক) রোপণ পদ্ধতি

কাটিং হতে চারা

- ৬-১২ মাস বয়সের কাটিং বর্ষার শুরুতে জুন-জুলাই (জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ়) মাসে জমিতে রোপণ করা যায়।
- আগাছা পরিস্কার করে রোপণের জমি তৈরি করতে হবে।
- চারা উত্তোলন পাত্র অথবা বীজতলা হতে চারা সাবধানে সংগ্রহ করে সরাসরি জমিতে লাইন করে রোপণ করতে হবে।
- বাসক চাষের বেলায় মাদা তৈরি করে নিতে হয়। ৯০ সে.মি. x ৯০ সে.মি. দূরত্বে মাদা তৈরি করতে হয়। মাদা অবশ্যই ৩০ সে.মি. দৈর্ঘ্য, ৩০ সে.মি. প্রস্থ, ৩০ সে.মি. গভীর করে ভালভাবে কুপিয়ে নেয়ার পর এক ডালি গোবর/কম্পোষ্ট সার ও মাটি দিয়ে ভরাট করে ৭ দিন ঢেকে রাখতে হয়। ৭ দিন পর মাটি ওলোট- পালট করে দিতে হবে। এরপর ২-৩ দিন পর চারা লাগাতে হবে।

খ) পরিচর্যা

- জমিতে কাটিং রোপণের পর বছরে ২ বার আগাছা পরিস্কার করতে হবে।
- মাঝে মাঝে রোপিত কাটিং-এর গোড়ার মাটি কুপিয়ে আলগা করে দিলে বাসকের বৃদ্ধি ভাল হয়।
- রোপণের পর চারাকে গবাদি পশুর আক্রমন হতে রক্ষা করতে হবে।
- ডাল-পালা ছাঁটাই অত্যন্ত জরুরি কারণ যত ডাল-পালা ছাঁটাই করা হবে তত বেশি পাতা গজাবে এতে গাছ প্রতি পাতা উৎপাদন অনেক বেশি হয়।
- খরা মৌসুমে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিয়ে সেচ প্রদানসহ মালচিং করতে হবে।
- গাছের রোগাক্রান্ত ডাল-পালা ছাঁটাই করে দিতে হবে।
- গাছের গোড়ায় যেন পানি না জমে সে জন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ, শুকানো ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

- ৩ মাস পর পর অর্থাৎ বৎসরে ৪ বার পরিপক্ক পাতা সংগ্রহ করা যেতে পারে।
- চারা লাগানোর ৩-৪ মাস পর ১ম বার পাতা সংগ্রহ করা যেতে পারে। পাতা পরিপক্ক হলে অর্থাৎ হলুদ রং হওয়ার আগ মূহুর্তে পাতা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

- সতর্কতার সাথে পাতা সংগ্রহ করতে হবে যাতে পাতার সাথে কোন প্রকার শাখা প্রশাখা না থাকে।
- পাতা সংগ্রহের পর আলতোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর পরিস্কার চট বা মাদুর বিছিয়ে তার উপর পাতা ছিটিয়ে রোদে শুকাতে হবে।
- পাতা ভালভাবে শুকাতে হবে যাতে পাতা হাতে নেয়ার পর মুঠি করলে মড়মড় শব্দে ভেঙ্গে যায়।
- খেয়াল রাখতে হবে যেন পাতা শুকানোর সময় বাহিরের ময়লা আবর্জনা না মিশে।
- পাতা শুকানোর পর তা বড় চটের ব্যাগে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে মাঝে মাঝে পাতা বের করে রোদে পূণরায় শুকিয়ে নিতে হবে।

ফলন

প্রতি বছরে ঝাড় প্রতি ২.৫-৩.০ কিলোগ্রাম কাঁচা পাতা সংগ্রহ করা যেতে পারে যা ভালভাবে শুকানোর পর প্রায় ৫০০ গ্রাম ওজন হয়ে থাকে।

বাজারজাত করণ

বাসক পাতার চাহিদা ঔষধ শিল্পে ব্যাপক। বিভিন্ন আয়ূর্বেদিক, ইউনানী ঔষধ কোম্পানী যেমন সাধনা, শক্তি, কুন্ডেশ্বরী, হামদার্দ ল্যাবরেটরীজ ইত্যাদি এবং আধুনিক ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানীতেও যেমন স্কয়ার ফার্মাসিটিক্যাল, এ্যাকমি ল্যাবরেটরীজ জেনস ফার্মাসিটিক্যাল-এ ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। উদাহরণস্বরুপ বলা যেতে পারে স্কয়ার ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানীর প্রতি মাসে বাসক পাতার চাহিদা হলো ১-২ টন। স্কয়ার প্রতি কেজি শুকনো পাতার মূল্য নির্ধারণ করেছে ৩২-৪০ টাকা। শুকনো পাতা বড় পলিব্যাগে ভরে বাজারজাত করতে হবে।

আয়-ব্যয়

(ক) প্রতি বিঘায় উৎপাদন ব্যয়

২ হাত দূরত্বে বাসক চারা লাগালে ১ বিঘা জমিতে মোট ৩০০০ হাজার চারার প্রয়োজন হয়।

উৎপাদন ব্যয়	পরিমাণ	দর (টাকা)	মূল্য (টাকা)
চারার মূল্য	৩০০০ টি	৩	৯,০০০
গোবর/কম্পোস্ট সার	৫০ ভ্যান	৫০	২,৫০০
মজুর / কামলা	৬ জন	১০০	৬০০
পরিবহন ও অন্যান্য	-	-	৫০০
		মোট	১২,৬০০

খ) মোট আয়

৩০০০ টি বাসক ঝাড় হতে সংগৃহীত শুকনো পাতার পরিমাণ = (৩০০০ x ০.৫) কিলোগ্রাম (শুকনো পাতার এক বছরে ঝাড় প্রতি ফলন ০.৫ কিলোগ্রাম) =১৫০০ কিলোগ্রাম মোট আয় = (১৫০০ x ৩২) টাকা (প্রতি কিলোগ্রাম শুকনো পাতার মূল্য ৩২ টাকা দরে) = ৪৮০০০ টাকা/ বিঘা মোট লাভ = মোট আয় - উৎপাদন ব্যয় (৪৮০০০ - ১২৬০০) টাকা = ৩৫৪০০ টাকা/ বিঘা

*** আয়-ব্যয়ের তথ্য ইন্টার কো-অপারেশন, বগুড়ার সহযোগিতায় সরাসরি কৃষকের মাঠ হতে ২০১১ সনে সংগৃহীত।**

ভেষজ উদ্ভিদ শতমূলী এর চাষ পদ্ধতি ও ব্যবহার

- আপনি কি শতমূলীর ঔষধি গুণের সাথে পরিচিত ?
- শতমূলীর মূলে প্রচুর ঔষধি গুণের কারণে দেশের ঔষধ শিল্পে এর ব্যবহার হচ্ছে।
- বাড়ীর আশে পাশে অব্যবহৃত পতিত জমিতে, ক্ষেতের আইলে, রাস্তার ধারে সাথী ফসল হিসাবে শতমূলী চাষ করে আপনি বাড়তি আয়ের সুযোগ নিতে পারেন।

শতমূলী

পরিচিতি

শতমূলী বিরুৎ জাতীয় বহুবর্ষজীবি আরোহী উদ্ভিদ। লতায় বাঁকানো কাঁটা থাকে। পাতাগুলো দেখতে সরু সুতোর মত। উদ্ভিদটি দেখতে খুব সুন্দর। অনেকে শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসাবে ফুল বাগানে, বাড়ীর উঠানে ও টবে লাগিয়ে থাকেন। শতমূলীর মূলগুলো গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় থাকে। দেখতে একগুচ্ছ মুলা অথবা একগুচ্ছ গাজরের মত। শরতকাল অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এর ফুল ও ফল হয়। ফলে সুগন্ধ থাকে। ফল দেখতে ছোট মটর দানার মত এবং কাঁচা অবস্থায় ফলের রং গাঢ় সবুজ ও পাকলে ফলের রং লাল হয়। শতমূলীর বৈজ্ঞানিক নাম *Asparagus recemosus* L.

ব্যবহার

ভেষজ ঔষধ হিসাবে শতমূলীর মূল ও পাতার রস আমাশয়, মৃগী, রাতকানা, স্বরভঙ্গ, স্তন্য শুস্কতায়, অম্লতা ইত্যাদি রোগে ব্যবহার হয়ে থাকে। শতমূলীর রাসায়নিক উপাদান Essential oil, Asparagin, Tyrosin.

নার্সারিতে চারা উত্তোলন কৌশল

সাধারনত বীজের মাধ্যমে শতমূলীর বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। মূলের স্যাকার থেকেও বংশ বিস্তার সম্ভব তবে তা সময় সাপেক্ষ। বীজ থেকে চারা উত্তোলনই অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।

ক) বীজ সংগ্রহ

মাঘ-ফাল্গুনে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি-মার্চে সতেজ, সবল ও রোগমুক্ত শতমূলী উদ্ভিদ থেকে পাকা ফল সংগ্রহ করে ফলের মাংসল অংশ সরিয়ে বীজ ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। সদ্যজাত সংগৃহীত বীজ ৫-৭ দিনের মধ্যে বপন করলে ৬০-৭৫% বীজ থেকে চারা গজায়। ১ কিলোগ্রাম ওজনের ফল থেকে ৮,০০০-৯,০০০ টি বীজ পাওয়া যায়।

বীজ

খ) বীজ সংরক্ষণ

রোদে ভাল করে শুকানো বীজ মুখবন্ধ পাত্রে ঘরের অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা জায়গায় ১-৩ মাস সংরক্ষণ করা যায়। তবে সংরক্ষণের সময়কাল দীর্ঘ হলে ধীরে ধীরে এর অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা লোপ পেতে থাকে।

গ) বীজ বপন

বীজ সংগ্রহের পর ২০-৩০ দিনের মধ্যে বপন করা উত্তম। সাধারণত ২ পদ্ধতিতে বীজ বপন করা হয়।

১) চারা উত্তোলন পাত্রে বীজ বপন

- মাটি ও গোবর সার ৩ ঃ ১ অনুপাতে মিশিয়ে মিশ্রণটি ছাকুনি দিয়ে চেলে চারা উত্তোলন পাত্র ভরতে হবে।
- মাটি ও গোবর সার ভর্তি চারা উত্তোলন পাত্র, ১.২০ মি. প্রস্থ এবং প্রয়োজনে দৈর্ঘ্য ৩.০ মি. হতে ১২.০ মি. পর্যন্ত বীজতলার বেডে সাজিয়ে রাখতে হবে।
- প্রতিটি চারা উত্তোলন পাত্রে ২-৩ টি বীজ সরাসরি বপন করতে হবে।

২) বীজ তলায় সরাসরি বীজ বপন

পর্যাপ্ত সূর্যের আলো, উঁচু ও শুষ্ক জায়গা বীজতলার জন্য নির্ধারণ করতে হবে। বীজতলা তৈরির জন্য বীজতলার মাটি খুব ভালভাবে কুপিয়ে এর সাথে পরিমাণমত (মাটি : গোবর সার = ৩:১) গোবর সার মিশিয়ে দিতে হবে। মাটি ও গোবর সারের ঢেলা ও টুকরা গুড়ো করে বীজতলাটি মসৃণ করে বীজ ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর বপন করতে হবে। এরপর পলিথিন বা খড়কুটো দিয়ে বীজতলাটি ঢেকে দিলে দ্রুত বীজ হতে চারা গজাতে সহায়ক হয়। প্রয়োজনে হালকাভাবে বীজতলায় ঝরণা দ্বারা পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।

চারা উত্তোলন বেড

ঘ) অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা

শতমূলী বীজের আবরন খুব শক্ত বিধায় চারা গজাতে বেশ সময় লাগে। ২০-২৫ দিনের মধ্যে চারা গজাতে শুরু করে। বীজের তাড়াতাড়ি অঙ্কুরোদগমের জন্য বীজগুলো ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে অথবা সাবধানে শিরিষ কাগজ দিয়ে বা পাকা মেঝেতে ঘষে বীজের উপরের শক্ত অংশের আবরণ তুলে নিলে দ্রুত চারা গজায়।

বাগান সৃজন ও পরিচর্যা

ক) রোপণ পদ্ধতি

- সাধারণত বেলে বা দো-আঁশ মাটিতে শতমূলী খুব ভাল জন্মে। এ মাটিতে উদ্ভিদটি রোপণ করলে মূলগুলো খুব পুষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে শতমূলীর বাগান সৃজনে বেলে দো-আঁশ মাটিযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।
- রোপণের জন্য নির্ধারিত জমির আগাছা পরিস্কার করতে হবে। রোপণের মাদার দৈর্ঘ্য ৩০ সে.মি., প্রস্থ ৩০ সে.মি. ও ৩০ সে.মি. গভীর করে ভালভাবে কুপিয়ে নেওয়ার পর গোবর /কম্পোস্ট সার মিশিয়ে মাটি দিয়ে মাদা ভরাট করে ৭ দিন ঢেকে রাখতে হবে। ৭ দিন পর মাটি উলট-পালট করতে হবে এবং ২-৩ দিন পর শতমূলীর চারা রোপণ করতে হবে।
- বীজতলায় বা পাত্রে উত্তোলিত অংকুরিত চারার বয়স ২-৩ মাস হলে জুলাই-আগস্ট (আষাঢ়-শ্রাবণ) মাসে শতমূলীর চারা রোপণ করতে হবে।
- শতমূলী একটি আরোহী উদ্ভিদ বিধায় চারা মাঠে লাগানোর সময় প্রতিটি চারার গোড়ায় উদ্ভিদটি বেরে উঠার জন্য একটি মাঝারি আকৃতির বাঁশের কাঠি পুতে উদ্ভিদটির সাথে হালকা করে বেঁধে দিতে হবে।

খ) পরিচর্যা

- মাঠে রোপিত চারা গবাদি পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে।
- মাঠে লাগানোর পর বছরে ২ বার আগাছা পরিস্কার করতে হবে।
- চারার গোড়ার মাটি কুপিয়ে আলগা করতে হবে।
- শতমূলী চাষের বেলায় কোনক্রমেই জমিতে পানি জমিয়ে রাখা যাবে না, প্রয়োজনে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- শুষ্ক মৌসুমে চারার গোড়ার মাটি আলগা করে হালকা সেচ প্রদান করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ, শুকানো ও সংরক্ষণ

কন্দ

- চারা রোপণের ২ বছর বয়স হতেই কন্দ সংগ্রহ করা যাবে।
- জমি হতে খুব সাবধানে মাটির ভিতরে আলগা করে কন্দ তুলতে হবে যেন কন্দগুলো মাটিতে ছিড়ে না থাকে।
- কন্দ সংগ্রহের পর কন্দগুলো পানিতে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে।
- কন্দগুলো রোদে শুকাতে হবে। এমনভাবে শুকাতে হবে যাতে কোন ভাবেই ভেজা ভেজা না থাকে এবং এতে যেন কোন প্রকার কীট পতঙ্গ ও ছত্রাকের আক্রমণ না হয় অর্থাৎ খুবই ভালভাবে শুকাতে হবে।
- শুকানোর পর চটের বস্তায় কন্দ সংরক্ষণ করতে হবে এবং মাঝে মাঝে রোদে দিতে হবে।

ফলন

- ২ বছরে একটি শতমূলীর গাছ হতে মোট ২ থেকে ২.৫ কিলোগ্রাম কাঁচা কন্দ পাওয়া যায়।
- চারা জমিতে রোপণের ২ বছর পর থেকে প্রতিটি শতমূলী উদ্ভিদ থেকে সম্পূর্ণ কন্দ সংগ্রহ না করে উদ্ভিদটি বাঁচিয়ে রেখে ১০০-৩০০ গ্রাম কন্দ সংগ্রহ করা যায়।
- প্রতি বছরই একই শতমূলী উদ্ভিদ থেকে উপরোক্তভাবে এই সংগ্রহের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়।

বাজারজাত করণ

ইউনানী ঔষধ কোম্পানী, হামদার্দ ল্যাবরেটরীজ, ফার্মাজেম, বিজি ল্যাবরেটরীজ, এপি, কুন্ডেশরী, সাধনা, শক্তি ঔষধালয় ও বিভিন্ন আর্য়ুবেদিক প্রতিষ্ঠান প্রতি কেজি কন্দ কাঁচা অবস্থায় ১০-১৫ টাকা দরে এবং শুকনোর পর ৮০-৩০০ টাকা / কেজি দরে সংগ্রহ করে।

আয়-ব্যয়

(ক) প্রতি বিঘায় উৎপাদন ব্যয়

২.৫ হাত দূরত্বে শতমূলীর চারা রোপণ করলে ১ বিঘা জমিতে ২০০০ টি চারার প্রয়োজন হয়।

উৎপাদন ব্যয়	পরিমাণ	দর (টাকা)	মূল্য (টাকা)
চারার মূল্য	২০০০ টি	১	২,০০০
গোবর/কম্পোস্ট সার	৭৫ ভ্যান	৫০	৩,৭৫০
জমি তৈরি/কামলা	১০ জন	১০০	১,০০০
পরিবহন ও অন্যান্য	-	-	২০০
		মোট	৬,৯৫০

খ) মোট আয়

২ বছর পর প্রতিটি শতমূলীর উদ্ভিদ হতে উৎপন্ন কন্দের ওজন ২.৫ কিলোগ্রাম হিসাবে ২০০০টি উদ্ভিদ হতে মোট উৎপাদন (২০০০ x ২.৫) = ৫০০০ কিলোগ্রাম এবং প্রতি কিলোগ্রাম শতমূলী কন্দের দর ১০ টাকা হিসাবে মোট মূল্য (৫০০০ x ১০) =৫০০০০ টাকা

মোট লাভ = মোট আয়-উৎপাদন ব্যয়

= (৫০০০০ - ৬৯৫০) টাকা / বিঘা

= ৪৩০৫০ টাকা / বিঘা।

* আয়-ব্যয়ের তথ্য ইন্টার কো-অপারেশন, বগুড়ার সহযোগিতায় সরাসরি কৃষকের মাঠ হতে ২০১১ সনে সংগৃহীত।

গ্রামীণ পতিত জমিতে ভেষজ উদ্ভিদের চাষ করে ঘরের দোড়ায় স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ নিন

ভেষজ উদ্ভিদ অশ্বগন্ধা এর চাষ পদ্ধতি ও ব্যবহার

- আপনি কি অশ্বগন্ধার চাষ ও ঔষধি গুণের সাথে পরিচিত হতে চান?
- অশ্বগন্ধায় প্রচুর মূল্যবান ঔষধি গুণ রয়েছে।
- অশ্বগন্ধাকে সাথী ফসল হিসাবে বাড়ির আঙ্গিনায়, পতিত জমিতে চাষ করে স্বাস্থ্য সেবাসহ অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হতে পারেন।

অশ্বগন্ধা

পরিচিতি

অশ্বগন্ধা একটি বর্ষজীবি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। গড় উচ্চতা ৭৫ থেকে ১০০ সে.মি. বা ১ মি.। বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট এই উদ্ভিদের কোমল পাতায় শ্বেত বর্ণের সাদা লোম থাকে। ফুল উভলিঙ্গ। ফল মটরের ন্যায় গোলাকার ও পাকলে লালবর্ণ ধারন করে। বীজ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, মসৃন ও চেপ্টা। অশ্বগন্ধার মূল বেশ নরম এবং মূল ভেংগে নিলে ভেতরটা সাদা দেখা যায়। নভেম্বর-ডিসেম্বর (কার্তিক-অগ্রহায়ন) মাস পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ (মাঘ-ফাল্গুন) মাস পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। অশ্বগন্ধার বৈজ্ঞানিক নাম *Withania somnifera* L. এবং ইহা Solanacae পরিবারভূক্ত।

ব্যবহার

অশ্বগন্ধার সম্পূর্ণ উদ্ভিদটিতেই (মূল, পাতা, ফল ও বীজে) ভেষজ গুনাগুণ রয়েছে। সাধারণত এই উদ্ভিদের মূল-খিচুনী, মাথা ব্যাথা, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, যৌন দুর্বলতা ও অনিদ্রায় ব্যবহৃত হয়। এছাড়া মায়ের দুধের পরিমাণ বাড়াতে এবং বার্ধক্য জনিত দুর্বলতা দূর করতে মূলের রস ব্যবহার হয়ে থাকে। ফল ও বীজ ক্ষুধা বর্ধক। দুধকে ঘনীভূত করার কাজে বীজ ব্যবহার হয়। অশ্বগন্ধায় রাসায়নিক উপাদান হিসাবে সাধারণত পাওয়া যায় Alkaloids, Withanoid and Terpenoids.

নার্সারিতে চারা উত্তোলন কৌশল

অশ্বগন্ধার চারা উত্তোলন কৌশল বিভিন্ন ধাপে সম্পূর্ণ হয়। এ ভেষজ উদ্ভিদটি সাধারণত বীজ দিয়ে চাষাবাদ করা হয়। চাষাবাদের জন্য বীজ থেকে চারা উৎপাদন করাই অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।

ক) বীজ সংগ্রহ

অশ্বগন্ধায় বছরে একবার ফুল ও ফল হয়ে থাকে। মার্চ (ফাল্গুন-চৈত্র) মাসে সতেজ, সবল ও রোগমুক্ত উদ্ভিদ বাছাই করে অশ্বগন্ধার পাকা ফল সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে ফলের খোসা ছাড়িয়ে বীজ সংগ্রহ করা হয়। ১০ গ্রাম ওজনের পাকা ফল হতে ৯৫ থেকে ১২৫টি ফল পাওয়া যায় এবং ১টি ফলের মধ্যে ২০ থেকে ২৫টি বীজ থাকে।

ফল

খ) বীজ সংরক্ষণ

- ফলের বহিরাবরন ও নরম অংশ রোদে শুকিয়ে সম্পূর্ণ ফল সংরক্ষণ করা যায়।
- ফল রোদে শুকিয়ে বহিরাবরন সরিয়ে বীজ সংরক্ষণ করা যায়।
- বীজ ভালভাবে শুকিয়ে মুখবন্ধ পাত্রে ঘরের তুলনামূলক ঠান্ডা জায়গায় রাখলে ২/৩ মাস সংরক্ষণ করা যায়।
- দীর্ঘদিন বীজ সংরক্ষণের জন্য ছত্রাক/কীটপতঙ্গ নাশক হিসাবে শুকনো নীমের পাতার গুড়ো ব্যবহার করা যায়।
- দীর্ঘদিন বীজ সংরক্ষণ করলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে লোপ পায়।

গ) বীজ বপন

বীজ সংগ্রহের পর ২০-৩০ দিনের মধ্যে বপন করা উত্তম। সাধারনত ২ পদ্ধতিতে বীজ বপন করা হয়।

(১) বীজতলায় সরাসরি বীজ বপন

বীজতলা তৈরির জন্য সাধারণত ১.২০ মি. প্রস্থে এবং প্রয়োজনে দৈর্ঘ্যে ৩.০ হতে ১২.০ মি. পর্যন্ত বীজতলার মাটি খুব ভালভাবে কুঁপিয়ে এর সাথে পরিমাণমত (মাটি ঃ গোবর = ৩ঃ১) গোবর সার মিশিয়ে দিতে হবে। মাটি ও গোবর সারের ডেলা ও টুকরা গুড়ো করে বীজতলাটি মসৃন করে বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে। বালু মিশ্রিত মসৃন মাটি দিয়ে বীজগুলো ঢেকে হাত দিয়ে হালকা করে চেপে দিতে হবে। ছোট বীজ সরাসরি বীজতলায় বপন না করাই উত্তম, কারণ বীজের আকৃতি ছোট/ক্ষুদ্র হলে বীজতলায় রোগ বালাইয়ের আক্রমণে বীজ নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

বীজ বীজ হতে চারা

(২) চারা উত্তোলন পাত্রে ক্ষুদ্র বীজ বপন

অপেক্ষাকৃত ছোট/ক্ষুদ্র বীজের ক্ষেত্রে বীজতলায় বীজ বপন না করে মাটির টব, কাঠের বাক্স অথবা ছিদ্রযুক্ত প্লাষ্টিক গামলা ইত্যাদি পাত্রে মাটি ভরে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে বীজ বপন করা যায়ঃ

- মাটি ও গোবর সার (৩ঃ১) পরিমাণ মত মিশিয়ে একটি পাত্রে চুলার আগুনে উত্তপ্ত করে জীবানু মুক্ত করণ ১৫ সে.মি. থেকে ২৫ সে.মি. ব্যাসের ছিদ্রযুক্ত প্লাষ্টিকের পট অথবা গামলার ভিতর খবরের কাগজ ছিদ্র করে বিছানো,
- জীবাণু মুক্ত মাটি-গোবর সারের মিশ্রণ মিহি করে চেলে গামলা অথবা প্লাস্টিকের পাত্র ভর্তি করণ।
- ৩ আঙ্গুলের ১ চিমটি (০.৫ গ্রাম) বীজ পাত্রের মাটিতে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- বীজের উপর বালু মিশ্রিত জীবানুমুক্ত মিহি মাটি ছিটিয়ে হালকাভাবে বীজ ঢেকে দিতে হবে।
- একটি বড় গামলার মধ্যে পানি ভরে ছত্রাকনাশক ডায়াথিন এম-৪৫ পাউডার, প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম পরিমাণ মিশাতে হবে।
- বপনকৃত বীজের পাত্রটি পানি ভর্তি গামলার মধ্যে এমনভাবে বসিয়ে দিতে হবে যাতে গামলার উপরের অংশ পানিতে ডুবে না যায়।
- বীজ বপনকৃত পাত্রের মাটি পুরোপুরি ভেজা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
- বীজের পাত্রটি গামলা হতে উঠিয়ে পাত্রের উপরিভাগের খোলা অংশ পলিথিন দিয়ে ভালভাবে ঢেকে পাত্রটি মুক্ত আলো বাতাসে রাখতে হবে।

ঘ) অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা (পাত্রে বপনকৃত বীজ)

- ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে চারা গজাতে শুরু করে,
- অঙ্কুরোদগমের শতকরা হার ৭০-৭৫ ভাগ।

ঙ) ব্যাগে চারা স্থানান্তর

- ৮-১০ দিন বয়সের ৪ পাতা যুক্ত চারা মাটি ভর্তি পাত্রে স্থানান্তর করা যায়।
- চারা স্থানান্তর করার পূর্বে ৩ঃ১ অনুপাতে মাটি ও গোবর সার মিশিয়ে মিশ্রণটি ছাকুনি দিয়ে চেলে চারা উত্তোলন পাত্র ভরতে হবে।
- বীজ বপণের পাত্র থেকে চারা সর্তকতার সাথে চিকন বাঁশের কাঠি দিয়ে উঠিয়ে মাটি ভর্তি চারা উত্তোলন পাত্রে রোপণ করতে হবে।
- চারাগুলো শক্ত করার জন্য রোপনকৃত পাত্রগুলো ৫-৭ দিন ছায়াতে রাখতে হবে। অতঃপর রোদে রাখা যাবে।
- চারা পাত্রে স্থানান্তর করার ১ (এক) মাস পর চারা মাঠে লাগানোর উপযুক্ত হয়।

বাগান সৃজন ও পরিচর্যা

ক) রোপণ পদ্ধতি

- বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ মে-জুন (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়) মাসে অর্শ্বগন্ধার চাষ করা যায়। এছাড়া বসত-বাড়ির আশেপাশের অনাবাদি উঁচু জমিতে অর্শ্বগন্ধা চাষ করা যেতে পারে।
- জলাবদ্ধতা এবং স্যাঁতসেতে ভিজা মাটিতে অশ্বগন্ধা বাঁচে না।
- রোপণের জন্য চিহ্নিত জমির আগাছা পরিস্কার করে কুপিয়ে নিতে হবে।
- ২৫-৩০ সে.মি. দুরে দুরে গর্ত করে লাইনে চারা লাগাতে হবে।
- বনজ ও ফলজ বৃক্ষের সাথেও স্বল্প মেয়াদি সাথি ফসল হিসাবে অর্শ্বগন্ধা রোপণ করা যায়।
- মাঠ পর্যায়ে ২ ঋতুতেই চাষ করতে দেখা যায় তবে শীত মৌসুমে অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর (আশ্বিন-কার্তিক) মাসে অর্শ্বগন্ধা চাষ করলে ফলন তেমন ভাল হয় না।

খ) পরিচর্যা

- অর্শ্বগন্ধা মাঠে লাগানোর পর নিয়মিত পরিচর্যার প্রয়োজন।
- প্রয়োজনে মাঝে মাঝে পরিমিত সেচ দিতে হবে।
- আগাছা পরিস্কার করতে হবে।
- চারার গোড়ার মাটি কুপিয়ে আলগা করে দিতে হবে।
- প্রয়োজনে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে।
- রোপনকৃত চারাকে গবাদি পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে।
- কীটনাশক / ছত্রাকনাশক ব্যবহার না করে প্রয়োজনে নিম পাতার রস পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর বাগানে স্প্রে করা যেতে পারে।

ফসল সংগ্রহ, শুকানো ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

- বীজ বপনের ৫-৬ মাসের মধ্যে শীত মৌসুমের প্রথম দিকে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (ভাদ্র-আশ্বিন) মাসে ফসল সংগ্রহ করা হয়। যখন গাছের পাতা শুকিয়ে যাবে এবং ফলগুলো লাল বর্ণ ধারণ করে তখন বুঝতে হবে ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হয়েছে।

- সম্পূর্ণগাছ এমনভাবে মাটি থেকে উত্তোলন করতে হবে যাতে মূলের ক্ষতি না হয়,
- মূলগুলো কান্ড থেকে এমনভাবে কাটতে হবে যেন মাটির নীচের মূলের সম্পূর্ণ অংশটুকুই থাকে,
- পৃথক করা মূলগুলো ভালোভাবে ধুয়ে পরিস্কার করে ২.৫ থেকে ৩.৫ সে.মি. লম্বা করে আড়াআড়ি ভাবে কেটে টুকরা করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, চাহিদার উপর কাটার আকার নির্ভর করে।
- পরিস্কার মাদুর/চটে মূলগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুকাতে হবে।
- অর্শ্বগন্ধার ফল পাকলে মূলসহ সম্পূর্ণ উদ্ভিদটি ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করতে হবে।
- ১ বছরের পরিপক্ক একটি সংগৃহীত অর্শ্বগন্ধায় পাতাসহ কান্ডের মোট ওজন ১০০-১৩০ গ্রাম,
- ১ বছরের পরিপক্ক একটি সংগৃহীত অর্শ্বগন্ধায় মূলের মোট ওজন ২০-২৫ গ্রাম,
- ১ বছরের পরিপক্ক একটি অর্শ্বগন্ধায় ফলের মোট ওজন ১০-১২ গ্রাম।
- মূল ভালভাবে শুকানোর পর চটের বস্তায় ভরে সংরক্ষণ করতে হবে। মাঝে মাঝে রোদে দিতে হবে। ৪ কেজি কাঁচা মূল শুকানোর পর ১ কেজি শুকনো মূল পাওয়া যায়।

ফলন

৬ মাসে ১ বিঘা থেকে ১৬০ কেজি শুকনো মূল পাওয়া সম্ভব।

বাজারজাত করণ

স্থানীয় বাজার ও ইউনানি, আয়ূর্বেদিক, ঔষধ কোম্পানিগুলোতে অর্শ্বগন্ধার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। হামদার্দ ল্যাবরেটরিজ, রোদে শুকানো মূলের মূল্য নির্ধারণ করছে প্রতি কিলোগ্রাম ১২০ টাকা এবং স্থানীয় বাজারে শুকনো মূল, কান্ড ও পাতা একত্রে প্রতি কিলোগ্রাম ১০০ টাকা দরে বিক্রি হয়।

আয়-ব্যয়

(ক) প্রতি বিঘায় উৎপাদন ব্যয় ঃ ১ বিঘা জমিতে ১ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

উৎপাদন ব্যয়	পরিমাণ	দর (টাকা)	মূল্য (টাকা)
বীজ	১ কেজি	২০০০ (বর্তমান বাজার দর)	২,০০০
হালচাষ	৪টি	১৫০	৬০০
গোবর/কম্পোস্ট সার	২০ ভ্যান	৫০	১,০০০
আন্তঃ পরিচর্যা	৮ জন শ্রমিক	১০০	৮০০
ফসল উত্তোলন	৬ জন শ্রমিক	১০০	৬০০
পরিবহন ও অন্যান্য			২০০
		মোট	৫,২০০

খ) মোট আয়

প্রাইভেট কোম্পানিতে মূলের বিক্রি হতে আয় প্রতি কিলোগ্রাম মূলের মূল্য ১২০ টাকা দরে ১৬০ কিলোগ্রাম শুকনো মূলের মূল্য (১২০ x ১৬০) টাকা = ১৯২০০ টাকা / বিঘা

স্থানীয় বাজারে বিক্রি হতে আয় ১০০ টাকা / কিলোগ্রাম দরে ১৬০ কিলোগ্রাম শুকনো মূলের মূল্য (১০০ x ১৬০) টাকা = ১৬০০০ টাকা / বিঘা

প্রাইভেট কোম্পানিতে বিক্রি করে মোট লাভ (১৯২০০ - ৫২০০) টাকা = ১৪০০০ টাকা / বিঘা

স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে মোট লাভ (১৬০০০ - ৫২০০) টাকা = ১০৮০০ টাকা / বিঘা

*** আয়-ব্যয়ের তথ্য ইন্টার কো-অপারেশন, বগুড়ার সহযোগিতায় সরাসরি কৃষকের মাঠ হতে ২০১১ সনে সংগৃহীত।**

"মনে রাখবেন ভেষজ উদ্ভিদ 'অর্শ্বগন্ধা' নিয়মিত চাষাবাদ ও পরিচর্যা আপনার অসুস্থতায় স্বাস্থ্য সেবাসহ আর্থিক সহায়তা দিবে"

ভেষজ উদ্ভিদ কালো তুলসির চারা উৎপাদন, চাষ ও ব্যবহার

কেন তুলসির চাষ করবেন?

- তুলসির বহুবিধ ভেষজ গুণের জন্য ওষুধ শিল্পে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে।
- চর্মরোগ, জ্বর, সর্দি, কাশি ইত্যাদিতে তুলসি ব্যাপক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- তুলসি পাতার চা খেলে ঠান্ডাজনিত সমস্যায় উপকার হয়।
- অব্যবহৃত পতিত জমিতে, বাড়ির আঙ্গিনায়, রাস্তার ধারে একক অথবা সাথী ফসল হিসেবে তুলসীর চাষ করে লাভবান হওয়া যায়।

কালো তুলসির চারা

জ্বর সর্দি কাশি হলে তুলসির রসে উপকার মেলে

পরিচিতি

তুলসি শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট একটি বর্ষজীবি সুগন্ধি গুল্ম। তুলসি ৪ (চার) জাতের হয়ে থাকে যেমন কালো তুলসি, সাদা তুলসি, রাম তুলসি ও বাবুই তুলসি। এ ছাড়াও তোকমাকে অনেকে দুলাল তুলসি বলে থাকেন। বিভিন্ন জাতের তুলসির মধ্যে ভেষজ ঔষধ হিসেবে কালো তুলসির ব্যবহার সর্বাধিক। কালো তুলসি উচ্চতায় ২/৩ ফুট হয়ে থাকে। এর মূল ও কান্ড কাষ্ঠল, পাতা বর্শাকৃতি এবং এর কিনারা অনিয়মিত ঢেউ খেলানো। পুষ্পমঞ্জুরী পাতাযুক্ত ও উভলিঙ্গ। শাখা প্রশাখার অগ্রভাগ থেকে পাঁচটি পুষ্পদন্ড বের হয়। প্রতিটি পুষ্পদন্ডের চারিদিকে ছাতার ন্যায় আকৃতি অনুসারে ১০-২০ স্তরে ফুল সাজানো থাকে। প্রতিটি স্তরে ৬ টি করে ছোট ফুল ফোটে। এর পাতা, ফুল ও ফলে একটি ঝাঁঝালো গন্ধ আছে এবং পাতা ও কান্ডের রং অনেকটা কালচে দেখায়। কালো তুলসির বৈজ্ঞানিক নাম (*Ocimum tenuiflorum* L.) এবং ইহা Lamiaceae পরিবারভূক্ত।

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশের সর্বত্রই বিক্ষিপ্তভাবে তুলসি জন্মাতে দেখা যায় অর্থাৎ এ দেশের জলবায়ু তুলসি চাষের উপযোগী।

রাসায়নিক উপাদান

তুলসিতে ক্যারিওফাইলিন, টারপিনীন, টারটেরিক, সিটরিক ও স্যালিক এসিড বিদ্যমান।

ব্যবহার

তুলসির পাতা,বীজ ও মূলে বিবিধ ভেষজ গুণাগুণ রয়েছে। প্রচলিত ধারণা তুলসির হাওয়া সংক্রামক ব্যাধিকে দূরে রাখে। এছাড়া এর সুগন্ধি পাকস্থলীর বায়ুনাশক, কফনাশক এবং জ্বর প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। সর্দি ও কফ কাশিতে কালো তুলসি পাতার রস অথবা পাতা চা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সাপ, মৌমাছি ও মশার কামড়ে তুলসি পাতার রস লাগানো হয়। এ রস বাহ্যিক ব্যবহারে চর্ম রোগ ও শরীরের কালো দাগ চলে যায়। এ ছাড়া চোখের ছানি রোগের চিকিৎসায় তুলসির রস ভাল কাজ দেয়। প্রস্রাব জনিত সমস্যায় পাতা পানিতে ভিজিয়ে খেলে উপকার হয়। ঠান্ডায় নাক বন্ধ হলে তুলসির শুকনো পাতার চূর্ণ নস্যি হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। শিশুদের পাকস্থলী ও যকৃত সংক্রান্ত সমস্যায় তুলসি পাতা ভিজিয়ে পানি খাওয়ালে ভাল কাজ দেয়। হিন্দু ধর্মালম্বীরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে তুলসি পাতা ব্যবহার করে থাকেন এবং তুলসির কাষ্টল কান্ড দিয়ে মালা তৈরি করে গলায় ঝুলিয়ে রাখেন।

নার্সারিতে চারা উত্তোলন কৌশল

তুলসির চারা উত্তোলন কৌশল বিভিন্ন ধাপে সম্পন্ন হয়। তুলসি বছরে দুইবার চাষ করা সম্ভব। সাধারণত বীজ থেকে তুলসির চাষা করা হয়। চাষের জন্য বীজ থেকে চারা উৎপাদন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।

ক) বীজ সংগ্রহ

তুলসিতে বছরে দু'বার ফুল ও ফল হয়। মে-জুন (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়) অথবা ডিসেম্বর-জানুয়ারী (অগ্রহায়ণ-পৌষ) মাসে সতেজ সবল ও রোগমুক্ত উদ্ভিদ বাছাই করে তুলসির বীজ সংগ্রহ করা হয়। পরিপক্ক ফল শুকিয়ে গেলে পুস্পদন্ডসহ কেটে নিতে হয়। তারপর রোদে শুকিয়ে বীজগুলো আলাদা করে সংগ্রহ করা হয়। বীজ গুঁড়ো চা পাতার মত খুবই ছোট। প্রতি ১০ গ্রাম বীজে ২৮,০০০-৩০,০০০টি বীজ পাওয়া যায়। একটি ফলের মধ্যে ৮ থেকে ১০ টি বীজ থাকে।

তুলসি বীজ

খ) বীজ সংরক্ষণ

- ফল রোদে শুকিয়ে বহিরাবরণসহ বীজ সংরক্ষণ করা যায়।
- বীজ ভালভাবে শুকিয়ে মুখবন্ধ পাত্রে ঘরের তুলনামূলক ঠান্ডা জায়গায় রাখলে ২ থেকে ৩ মাস বীজ সংরক্ষণ করা যায়।
- বীজ সংরক্ষণের সময় ছত্রাক ও কীট নাশক হিসেবে নিমের শুকনো পাতার গুঁড়ো ব্যবহার করা যায়।
- দীর্ঘদিন বীজ সংরক্ষণ করলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।

গ) বীজ বপন

বীজ সংগ্রহের পর ৭-১০ দিনের মধ্যে বপন করা উত্তম। সাধারণত দুই পদ্ধতিতে বীজ বপন করা হয়।

১. বীজতলায় সরাসরি মাটি বেড়ে বীজ বপন

বীজতলা তৈরির জন্য (সাধারণত ১.২ মিটার প্রস্থে এবং প্রয়োজনে দৈর্ঘ্যে ৩ মিটার হতে ১২ মিটার পর্যন্ত) বীজতলার মাটি খুব ভালভাবে কুঁপিয়ে এর সাথে পরিমাণমত (মাটিঃগোবর = ৩ঃ১) গোবর সার মিশিয়ে দিতে হবে। মাটি ও গোবর সারের ডেলা গুঁড়া করে বীজতলাটি মসৃণ করে বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে। বালু মিশ্রিত মসৃণ মাটি দিয়ে বীজগুলো ঢেকে হাত দিয়ে হালকা করে চেপে দিতে হবে। ছোট বীজ সরাসরি বীজতলায় বপন না করাই উত্তম কারণ বীজের আকৃতি ছোট/ক্ষুদ্র হলে বীজতলায় রোগ-বালাইয়ের আক্রমণে বীজ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২. চারা উত্তোলন পাত্রে ক্ষুদ্র বীজ বপন

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বীজের ক্ষেত্রে বীজতলায় বীজ বপন না করে মাটির টব, কাঠের বাক্স অথবা ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিকের গামলা ইত্যাদি পাত্রে মাটি ভরে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে বীজ বপন করা যায়।

- মাটি ও গোবর সার (৩ঃ১) পরিমাণমত মিশিয়ে একটি পাত্রে চুলার আগুনে উত্তপ্ত করে জীবানুমুক্ত করে নিন।
- ৬ ইঞ্চি থেকে ৯ ইঞ্চি ব্যাসের ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিকের পট অথবা গামলার ভিতর খবরের কাগজ ছিদ্র করে বিছিয়ে দিন।
- জীবানুমুক্ত মাটি গোবর সারের মিশ্রণ মিহি করে চেলে গামলা অথবা প্লাস্টিকের পাত্র ভর্তি করুন।

- ০.৫ গ্রাম (৩ আঙ্গুলের ১ চিমটি) বীজ পাত্রের মাটিতে সমানভাবে ছিটিয়ে দিন।
- বীজের উপর বালু মিশ্রিত জীবানুমুক্ত মিহি মাটি ছিটিয়ে হালকাভাবে বীজ ঢেকে দিন।
- একটি বড় গামলার মধ্যে পানি ভরে ছত্রাকনাশক ডায়থেন এম-৪৫ পাউডার ২ গ্রাম/ লিটার পানি হিসাবে মিশিয়ে দিন।
- বপনকৃত বীজের পাত্রটি পানি ভর্তি গামলার মধ্যে এমনভাবে বসিয়ে দিতে হবে যাতে গামলার উপরের অংশ পানিতে ডুবে না যায়।
- বীজ বপনকৃত পাত্রের মাটি পুরোপুরি ভেজা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।
- বীজের পাত্রটি গামলা হতে উঠিয়ে পাত্রের উপরিভাগের খোলা অংশ পলিথিন দিয়ে ভালভাবে ঢেকে পাত্রটি মুক্ত আলো-বাতাসে রাখুন।

ঘ) অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা (পাত্রে বপনকৃত বীজ)

- ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে চারা গজাতে শুরু করে।
- অঙ্কুরোদগমের শতকরা হার ৬৫-৭৫ ভাগ।

ঙ) ব্যাগে চারা স্থানান্তর

- ৭ থেকে ১০ দিন বয়সের চার পাতাযুক্ত চারা মাটি ভর্তি পাত্রে স্থানান্তর করুন।
- চারা স্থানান্তর করার পূর্বে ৩ঃ১ অনুপাতে মাটি ও গোবর সার মিশিয়ে মিশ্রণটি ছাকুনি দিয়ে চেলে চারা উত্তোলন পাত্রে পূর্ণ করে নিন।
- বীজ বপনের পাত্র থেকে চারা সতর্কতার সাথে চিকন বাঁশের কাঠি দিয়ে উঠিয়ে মাটি ভর্তি চারা উত্তোলন পাত্রে রোপণ করুন।
- চারাগুলো শক্ত করার জন্য রোপণকৃত পাত্রগুলো ৫/৭ দিন ছায়াতে রাখুন, অতঃপর রোদে স্থানান্তর করুন।
- চারা পাত্রে স্থানান্তর করার ১ (এক) মাস পর মাঠে লাগানোর উপযুক্ত হয়।

বাগান সৃজন ও পরিচর্যা

ক) রোপণ পদ্ধতি

- সাধারণত দোঁআশ মাটিতে তুলসি খুব ভাল জন্মে। এ ক্ষেত্রে তুলসির বাগান সৃজনে দোঁ-আশ মাটিযুক্ত জমি নির্বাচন করাই উত্তম।
- রোপণের জন্য নির্ধারিত জমির আগাছা পরিস্কার করতে হবে।
- রোপণের গর্তের দৈর্ঘ্য ১৫ সে.মি., প্রস্থ ১৫ সে.মি.ও ১৫ সে.মি.গভীর করে ভালভাবে কুঁপিয়ে নেওয়ার পর গোবর সার মিশানো মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করে ৭ দিন ঢেকে রাখতে হবে।
- ৭ দিন পর মাটি ওলট-পালট করতে হবে এবং ২ থেকে ৩ দিন পর তুলসির চারা রোপণ করতে হবে।
- বীজতলা বা পাত্রে উত্তোলিত অঙ্কুরিত চারার বয়স ১ মাস হলে মে-জুন (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়) মাসে চারা রোপণ করতে হবে।
- রোপণের সময় চারা থেকে চারার দুরত্ব ৪৫ সে.মি থেকে ৫০ সে.মি হতে হবে।
- রোপিত চারার গোড়ায় ১টি করে লম্বা ও চিকন বাঁশের কাঠি পুতে কাঠির সাথে চারা বেঁধে দিতে হবে।

খ) পরিচর্যা

- তুলসি বাগানে সাধারণত তেমন রোগ-বালাই দেখা যায় না তবে মাঝে মাঝে পিঁপড়ার আক্রমণ দেখা যায়,
- তুলসির বাগান সৃজনের পর নিয়মিত পরিচর্যা করুন,
- প্রয়োজনে মাঝে মাঝে পরিমিত সেচ দিন,
- নিয়মিত আগাছা পরিস্কার করুন,
- মাঝে মধ্যে চারার গোড়ায় মাটি কুঁপিয়ে আলগা করে দিন,
- প্রয়োজনে জৈব সার ব্যবহার করুন।

ফসল সংগ্রহ, শুকানো ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

- মাঠে চারা রোপণের ৪-৫ মাসের মধ্যে মূলসহ গাছ সংগ্রহ করা যায়।
- সাধারণত পরিপক্ক পাতার চাহিদাই বেশি।
- পরিপক্ক গাছ মূলসহ উঠিয়ে পানিতে ধুয়ে পরিস্কার করার পর পাটি/মাদুর বিছিয়ে হালকা রোদে অথবা আলো-বাতাস চলাচল করে এমন ছায়াযুক্ত স্থানে শুকাতে হয়।
- যদি শুকানো পাতা হাতের মুঠোয় নিয়ে চাপ দিলে ভেঙ্গে যায় তবে বুঝতে হবে সঠিকভাবে শুকিয়েছে। শুকনো তুলসি পাতা চটের ব্যাগে ভরে মুখ বেঁধে সংরক্ষণ করা যায়। মাঝে মাঝে ব্যাগসহ রোদে শুকিয়ে নিলে সহজে নষ্ট হয় না। ৫ কেজি তুলসি শুকানোর পর প্রায় ১ কেজি ৫০০ গ্রাম ওজন হয়ে থাকে।

ফলন

এক (১) শতক জমিতে ৪৫ সে.মি. দূরে দূরে একটি তুলসি চারা রোপণ করলে প্রতি ছয় মাস পর পর তুলসি সংগ্রহ করা যায়। সুতরাং সে হিসাবে ২১০ চারা লাগানো যায়। যদি ৬ মাস বয়সের একটি তুলসি গাছের ওজন ৩০০-৩৫০ গ্রাম হয় তাহলে এক একর জায়গা থেকে বছরে (৩০০ গ্রাম X ২১০) X ১০০=৬,৩০০,০০০ গ্রাম বা ৬,৩০০ কেজি কাঁচা তুলসি সংগ্রহ করা যায়। যা শুকানোর পরে ১,৮৯০ কেজি হয়।

বাজারজাত করণ

স্থানীয় বাজারে ও ইউনানী এবং আয়ুর্বেদিক ওষুধ শিল্পে তুলসির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ফুল আসার আগে অপরিপক্ক সংগৃহীত সম্পূর্ণ গাছ ৭ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হয়ে থাকে। আবার অনেক কোম্পানীতে ১ থেকে ১.৫ মাস বয়সী তুলসি গাছের চাহিদা থাকে। সেক্ষেত্রে, লালশাক চাষের মত বীজ ছিটিয়ে তুলসির বাগান করা যায়। তবে এ পদ্ধতিতে বীজ একটু বেশি লাগে।

আয়-ব্যয়

(ক) উৎপাদন ব্যয় (২০১১ সনের হিসাব অনুযায়ী)

১ শতক জমিতে ৪৫ সে.মি. (১ হাত) দুরত্বে তুলসি চারা লাগালে ২ বারে মোট ২১০ X ২ = ৪২০টি চারা লাগানো যায়। অতএব ১ একর জায়গা থেকে বছরে ২১০ X ১০০= ২১,০০০ টি তুলসি গাছ পাওয়া যাবে।

উৎপাদন	পরিমাণ	দর (টাকা)	মূল্য (টাকা)
১) বীজ	২৫ X ১০০ = ২৫০০ গ্রাম/২.৫কেজি	১০,০০০(বর্তমান বাজার দর)	২৫,০০০/ -
২) হালচাষ	১ X ১০০টি=১০০টি	৫০	৫,০০০/ -
৩) গোবর/কম্পোস্ট সার	৩৭ X ১০০কেজি=৩৭০০কেজি	৫০ (প্রতি মণের দাম)	৫,০০০ /-
৪) আন্তঃ পরিচর্যা	-	-	-
৫) ফসল উৎপাদন	৫০ জন শ্রমিক (পূর্ণ দিবস)	২০০	১০,০০০ /-
৬) অন্যান্য (বপন ও সেচ)	---	------	৫,০০০/ -
		মোট	৫০,০০০/ -

খ) মোট আয়

প্রতি কেজি তুলসির (কান্ড ও পাতাসহ) মূল্য ৪০ টাকা দরে ৬,৩০০ কেজির মূল্য = (৪০ X ৬,৩০০ কেজি) = ২,৫২,০০০ টাকা /একর

এক শতকে একবারে বীজ পাওয়া যায় ৯০০ থেকে ৯৮০ গ্রাম এবং দুইবারে যা দ্বিগুণ হয় অর্থাৎ ৯০০ গ্রাম বা ০.৯ কেজি। অর্থাৎ এক একরে বীজের পরিমান ৯০,০০০ গ্রাম বা ৯০ কেজি ১০,০০০/- দরে যার মূল্য ৯, ০০০০০/-টাকা।

মোট আয় = (২,৫২,০০০+৯,০০,০০০) = ১১,৫২,০০০/-টাকা /একর

তুলসির চাষ করুন, সর্দি জ্বর থেকে মুক্ত থাকুন এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হন

ভেষজ উদ্ভিদ কালোমেঘের চারা উৎপাদন, চাষ ও ব্যবহার

- কালোমেঘ তিক্ত স্বাদযুক্ত একটি ভেষজ উদ্ভিদ।
- রক্ত পরিষ্কারক হিসেবে কালোমেঘ বেশ উপকারী ।
- কালোমেঘ ভেষজ ওষুধ শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
- একক ও সাথী ফসল হিসেবে চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

কালোমেঘের চারা

পরিচিতি

কালোমেঘ শাখা-প্রশাখাযুক্ত একটি বর্ষজীবি উদ্ভিদ। এটি উচ্চতায় ৬০-৯০ সে.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। অঞ্চলভেদে কালমেঘ- চিরতা, কল্পনাথ ইত্যাদি নামে পরিচিত। কান্ড চার কোনাকৃতি, নরম ও সবুজ। পাতার অগ্রভাগ ও বোটার দিক ক্রমশ সরু, দেখতে অনেকটা মরিচ পাতার মত। বর্ষার শেষদিকে পত্রকক্ষ থেকে লম্বা পুস্প দন্ড বের হয়। এ পুস্পদন্ডে হালকা সাদার মাঝে বেগুনী ফোঁটাযুক্ত ফুলগুলি সাজানো থাকে। পুংকশর লোমমুক্ত। গর্ভকেশর দু'টি, ফল ক্যাপসুল জাতীয় সরু ও লম্বা। প্রতিটি ফলে সাধারণত ৮-১২ টি বীজ থাকে। বীজগুলো দেখতে সরিষার দানার মত, তবে আকৃতিতে ছোট। কালোমেঘের বৈজ্ঞানিক নাম *Andrographis paniculata* এবং ইহা Acanthaceae পরিবারভুক্ত।

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশের সর্বত্রই কম বেশি কালোমেঘ দেখা যায়। তবে সিলেট এবং ময়মনসিংহ এলাকায় বেশি জন্মে। পার্বত্য অঞ্চলের দীঘিনালা, নোয়াপাড়া, আলুটিলা ইত্যাদি স্থানেও কালোমেঘ জন্মাতে দেখা যায়।

রাসায়নিক উপাদান

কালোমেঘিন, এনড্রোফোলাইড, ফেনল, স্টেরল, গ্লাইকোসাইড ইত্যাদি রাসায়নিক উপাদান কালোমেঘে পাওয়া যায়।

ব্যবহার

কালোমেঘের সমগ্র অংশ ভেষজ ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। পেটের বিভিন্ন সমস্যা যেমন আমাশয়,বদহজম,অম্লতা উদরাময় ইত্যাদি রোগে পাতার রস ও কান্ড ভেজানো পানি বেশ উপকার দেয়। কৃমিনাশক ও রক্ত পরিস্কারক হিসেবেও পাতার রস ভাল কাজ করে। ম্যালেরিয়া জ্বর ও ডায়াবেটিসেও কান্ড ভিজানো পানি খালি পেটে পান করলে উপকার হয়। এছাড়া চর্মরোগেও পাতার রস বা পাতাসেদ্ধ পানি পান করলে অথবা ক্ষতস্থান ধুয়ে দিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

নার্সারিতে চারা উত্তোলন কৌশল

সাধারণত কালোমেঘের বীজ প্রাকৃতিকভাবে মাটিতে পড়ে চারা গজায়। ব্যাপক চাষাবাদের ক্ষেত্রে বীজ থেকে চারা উত্তোলন করা হয়।

ক) বীজ সংগ্রহ

জুন-জুলাই (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়) মাসে কালোমেঘে ফুল হয় এবং ডিসেম্বর-জানুযারি (পৌষ-মাঘ) মাসে পাকা ফল পাওয়া যায়। ফল পাকলে ফেটে গিয়ে বীজ মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে তাই ফল পেকে ফাটার আগেই সংগ্রহ করতে হবে। এ সময়ে পাকা ফল সংগ্রহ করে কাপড় দিয়ে ঢেকে রোদে শুকালে ফল ফেটে বীজ বেরিয়ে আসে।

খ) বীজ সংরক্ষণ

শুকনো বীজ মুখবন্ধ পাত্রে তুলনামূলক ঠান্ডা জায়গায় রাখলে ১৫-২০ দিন সংরক্ষণ করা যায়। ফলে বীজ সংরক্ষণে বিষকাটালি, নিমের শুকনো পাতা ব্যবহার করে বীজ সংরক্ষণ দীর্ঘায়িত করা যায়।

বীজতলা তৈরি ও বীজ বপন

কালোমেঘের বীজ অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় বীজতলায় সরাসরি বীজ বপন করলে অধিক পরিমাণ বীজের প্রয়োজন হয়। আবার বীজ অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় বীজতলায় পানি সেচের সময় বীজ একসাথে জমা হয়ে গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ক্ষুদ্র বীজ হতে সরাসরি বীজতলায় চারা উত্তোলন ঝুঁকিপূর্ণ ও অলাভজনক। তাই আমরা ক্ষুদ্র বীজ বীজতলায় সরাসরি বপন না করে পাত্রে বপন করতে পারি। এ পদ্ধতি অধিকতর লাভজনক ও বীজ-সাশ্রয়ী।

পাত্রে ক্ষুদ্র বীজ বপন পদ্ধতি

ক্ষুদ্র বীজের ক্ষেত্রে বীজ সরাসরি বীজতলায় বপন না করে মাটির টব, কাঠের বাক্স অথবা ছিদ্রযুক্ত প্লাষ্টিকের পাত্রে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে বপন করা যায়।

ক) মাটি গোবর সার সংগ্রহ এবং পরিশোধন

- প্রয়োজন মত জমির উপরিভাগের উর্বর মাটি ও কমপক্ষে ৩ মাসের পুরাতন গোবর সংগ্রহ করতে হবে।
- ৩ ভাগ মাটি ও ১ ভাগ গোবর সার মিশিয়ে ভালভাবে গুড়ো করে রোদে ভালভাবে শুকিয়ে চালুনি দিয়ে চেলে নিতে হবে।
- একটি পাত্রে মাটি ও গোবরের মিশ্রণটি উত্তপ্ত করে পরিশোধিত করতে হবে।

খ) বীজ বপনের জন্য পাত্র প্রস্তুতকরণ

- বীজ বপন ও চারা উত্তোলনের জন্য ১৫-২৩ সে.মি. ব্যাসের অথবা প্রয়োজনীয় মাপের ছিদ্রযুক্ত প্লাষ্টিকের পাত্র, কাঠের বাক্স অথবা মাটির পাত্র সংগ্রহ করতে হবে।
- ছিদ্রযুক্ত পাত্রের ভিতরের দিকে খবরের কাগজ ছিদ্র করে পাত্রের সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে বিছিয়ে দিতে হবে।
- পরিশোধিত মাটি ও গোবর সারের গুঁড়ার মিশ্রণ দ্বারা পাত্রটি ভর্তি করে নিতে হবে এবং পাত্রের সার মিশ্রিত মাটির উপরিভাগ একটা চেপ্টা কাঠি দ্বারা সমান করতে হবে।

গ) পাত্রে বীজ বপন

- রোগমুক্ত মাতৃ উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত সুস্থ সবল বীজ বপন করতে হবে।
- ০.৫ গ্রাম (তিন আঙ্গুলের ১ চিমটি) বীজ প্রয়োজনমত পরিশোধিত মিহি মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে ভর্তিকৃত মাটি ও গোবরের মিশ্রণের উপরিভাগে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- তারপর পরিশোধিত মিহি মাটি ছিটিয়ে বীজের উপরিভাগ হালকাভাবে ঢেকে দিতে হবে।

ঘ) বীজ বপনকৃত পাত্রে পানি সেচ

- চারা উত্তোলন পাত্রে ঝরণা দিয়ে পানি না ছিটিয়ে পাত্রটি ভিজিয়ে পানি সরবরাহ করতে হবে। এতে মাটি সহজে পানি শোষণ করে নেয়।
- এ জন্য প্রয়োজন একটি প্লাষ্টিকের বড় গামলা, যার ভেতর চারা উত্তোলন পাত্রটি সহজেই বসানো যায়।
- বড় গামলাটির মধ্যে পানি ভরে ছত্রাকনাশক ডায়থেন এম-৪৫ পাউডার ২ গ্রাম পরিমাণ প্রতি লিটার পানিতে গুলিয়ে নিতে হবে।

- বপনকৃত বীজের পাত্রটি পানি ভর্তি গামলার মধ্যে এমনভাবে বসিয়ে দিতে হবে যাতে গামলার উপরের অংশ পানিতে ডুবে না যায়।
- বীজ বপনকৃত পাত্রের মাটি পুরোপুরি ভেজা পযন্ত অপেক্ষা করতে হবে ।
- বীজের পাত্রটি পুরোপুরি ভেজার পর গামলা হতে উঠিয়ে পাত্রের উপরিভাগের খোলা অংশ পলিথিন দিয়ে ভালভাবে ঢেকে পাত্রটি সরাসরি সূর্যের আলোতে না রেখে মুক্ত আলো-বাতাসে রাখতে হবে।
- প্রতিদিন খেয়াল রাখতে হবে, বপনকৃত পাত্রের মাটি যেন শুকিয়ে না যায়। প্রয়োজনে পূর্বের ন্যায় একই পদ্ধতিতে বীজের পাত্রটি গামলা ভর্তি পানিতে ভিজিয়ে নিতে হবে। কিন্তু কোনক্রমেই বপনকৃত বীজের পাত্রের মাটি যেন শুকিয়ে বা ফেটে না যায়।

পাত্রে বপনকৃত বীজের অঙ্কুরোদগম

- বীজ বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে চারা গজাতে শুরু করে।
- সাধারণতঃ অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ।

এখানে উল্লেখ্য যে,পাত্রে বপনকৃত বীজের অংকুরোদগমের আগে ও পরে পিঁপড়ার আক্রমণ ও গোড়াপচা রোগ দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে ছাই, বিষকাটালি, হলুদের গুড়া ছিটিয়ে পিঁপড়া দমন এবং ডায়াথেন এম-৪৫ পাউডার ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে গুলিয়ে চারার গোড়ায় প্রয়োগ করে, গোড়া পচা রোগ দমন করা যায়।

বীজতলায় বপনকৃত বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা

বীজ বপনের দুই সপ্তাহের মধ্যে বীজ গজাতে শুরু করে। সাধারণত অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৪৫-৫০ ভাগ।

ব্যাগে চারা স্থানান্তর

১০ থেকে ১২ দিন বয়সের পাতাযুক্ত চারা মাটিভর্তি ব্যাগে স্থানান্তর করতে হবে। বীজ বপন পাত্র থেকে চিকন বাঁশের কাঠি দিয়ে সতকর্তার সাথে চারা উঠিয়ে ব্যাগে রোপণ করতে হবে। চারাগুলো শক্ত করার জন্য রোপণকৃত পাত্রগুলো ৫-৭ দিন ছায়াতে রাখতে হবে। তারপর রোদে রাখা যাবে। এক মাস বয়সের চারা মাঠে লাগানোর উপযুক্ত হয়।

বাগান সৃজন ও পরিচর্যা

বসতবাড়ির আশে-পাশে পরিত্যক্ত স্যাঁতসেতে জমিতে কালোমেঘের বাগান ভালো হয়।

ক) রোপণ পদ্ধতি

- এক মাস বয়সের চারা বর্ষার শুরুতে জুন-জুলাই (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়) মাসে জমিতে রোপণ করা যায়। আগাছা পরিস্কার করে সেগুলো পুড়িয়ে দিতে হয় এবং বিষকাটালি ছেচে পানির সাথে গুলিয়ে মাটিতে ছিটিয়ে পোকা মাকড় দমন করে নেওয়া উত্তম। অতপরঃ রোপণের জন্য ১৫ সে.মি. x ১৫ সে.মি. x ১৫ সে.মি. আকারের গর্ত করে মাদা তৈরি করতে হয়। চারা উত্তোলন ব্যাগ হতে চারা সাবধানে সংগ্রহ করে সরাসরি রোপণের জন্য চিহ্নিত স্থানে রোপণ করা হয়। চারা রোপণের দূরত্ব ৪৫ সে.মি x ৪৫ সে.মি. হলে ভাল হয়। বনজ বৃক্ষের সাথে সাথী ফসল অথবা একক হিসেবে দুটি বৃক্ষের মাঝে কালোমেঘের চারা রোপণ করা যেতে পারে

খ) পরিচর্যা

- কালোমেঘের চারা মাঠে লাগানোর পর চারার পরিচর্যা করতে হবে। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে পরিমিত সেচ দিতে হবে এবং গোড়ার মাটি আলগা করে দিলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। জমিতে রোপণের পর দুই মাস অন্তর অন্তর দুই বার আগাছা পরিস্কার করতে হয়। প্রয়োজনে প্রতি চারার গোড়ায় ২৫০ গ্রাম জৈব সার ব্যবহার করা যেতে পারে

ফসল সংগ্রহ, শুকানো ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

শীতের শেষে অর্থাৎ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি (মাঘ-ফাল্গুন) মাসে মূল ছাড়া সম্পুর্ন উদ্ভিদটি সংগ্রহ করা যায়। উদ্ভিদটি সংগ্রহের পর পাটি বিছিয়ে হালকা রোদে কিংবা বাতাসে শুকাতে হবে। উদ্ভিদটি ভালভাবে শুকানোর পর হাতের মুঠায় নিয়ে চাপ দিলে ভেঙ্গে যাবে। তখন বুঝতে হবে উদ্ভিদটি সঠিকভাবে শুকানো হয়েছে। ২ কেজি কাঁচা কালোমেঘ (মূল ছাড়া) উদ্ভিদ শুকালে ১ কেজি শুকনো উদ্ভিদ পাওয়া যায়। পরিস্কার চটের বস্তায় ভরে মুখ বেঁধে শুকনো উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা হয় এবং ছত্রাকজনিত আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে রোদে দিতে হয়।

ফলন

এক শতক জমিতে ৪৫ সে.মি. x ৪৫ সে.মি. দূরত্বে একটি করে কালোমেঘের চারা রোপণ করলে ২১০টি চারা লাগানো যায়। প্রতি ছয় মাস পর পর কালোমেঘ সংগ্রহ করা যায়। লাগানোর ৬ মাস পর কালোমেঘ সংগ্রহ করা যায়। ৬ মাস বয়সের একটি কালোমেঘ উদ্ভিদের ওজন ৪০০-৪২০ গ্রাম হয় তাহলে এক একর (১০০ শতাংশ) জায়গা থেকে বছরে ৪০০ গ্রাম x ২১০ x ১০০ = ৮,৪০০,০০০ গ্রাম বা ৮,৪০০ কেজি কাঁচা কালোমেঘ সংগ্রহ করা যায়। যা শুকানোর পরে ৩,৩৬০ কেজি হয়।

আয়-ব্যয়ঃ

(ক) উৎপাদন ব্যয়

১ শতক জমিতে ৪৫ সে.মি. (১ হাত) দুরত্বে কালোমেঘ-এর চারা লাগালে ২১০টি চারা লাগানো যায়। সে হিসেবে এক একরে ২১০ x ১০০ = ২১০০০ টি গাছ পাওয়া যায়।

উৎপাদন	পরিমাণ	দর (টাকা)	মূল্য (টাকা)
১) চারার মূল্য	২১০ x ১০০টি	১/-	২১,০০০.০০
২) হালচাষ	১ x ১০০টি	৫০	৫,০০০.০০
৩) গোবর/কম্পোস্ট সার	১x১০০ মণ	৫০	৫,০০০.০০
৪) জমি তৈরি /কামলা	৫০ জন শ্রমিক (পূর্ণ দিবস)	২০০/-	১০,০০০.০০
		মোট	৪১,০০০.০০

খ) মোট আয়

প্রাইভেট কোম্পানীগুলো মূল ছাড়া ডাল-পালা ও পাতাসহ কালোমেঘ বিক্রি হতে আয় প্রতি কেজি ৫০/- টাকা দরে ৩৩৬০ কেজি শুকনো উদ্ভিদের মূল্য (৩৩৬০x ৫০) ১,৬৮,০০০/-টাকা / একর এক শতকে বীজ পাওয়া যায় ১.০০ কেজি অর্থাৎ এক একরে (১.০০ x ১০০) = ১০০ কেজি বীজ। ৪,০০০/- দরে যার মূল্য ৪০,০০০/-টাকা।

মোট আয় = (১,৬৮,০০০+৪০,০০০) = ২,০৮,০০০/- একর

গ) মোট লাভ

(২,০৮,০০০ - ৪১,০০০) টাকা = ১,৬৭,০০০ টাকা / একর

* যেহেতু ৬ মাসে কালোমেঘের চারা সংগ্রহ করা যায়, সে হিসাবে বছরে ২ বার চাষ করা সম্ভব। ফলে লাভের সম্ভাবনা ও দ্বিগুন হয়ে যায়।

* আয়-ব্যয়ের তথ্য ইন্টার কো-অপারেশন বগুড়ার সহযোগিতায়, ২০১১ সালে সরাসরি কৃষকের মাঠ হতে সংগৃহীত

কালোমেঘের রস খেলে পেটের পীড়া যাবে চলে

আগর চাষ পদ্ধতি

আগর কি?

জীবন্ত আগর গাছের স্বাভাবিক সাদা রঙের কাঠের মধ্যে ঘন বাদামী থেকে কাল রঙের এক প্রকার তৈলাক্ত আঠালো রস (oleoresin) নিঃসৃত হয়, যা আগর নামে পরিচিত। গাছের কান্ড, ডাল, এমনকি শিকড়েও অনিয়মিত ছোপ-ছোপ অথবা লম্বা-লম্বা দাগ হিসেবে আগর জমা হয়। আগরসমৃদ্ধ কাঠ আগুনে পুড়ালে অথবা নিষ্কাশিত তেল বা আতর ব্যবহার করলে এক প্রকার কাষ্ঠল মিষ্টি সুবাস বের হয়। এ তেল এক প্রকার রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ, যার মধ্যে প্রায় ৫০-৬০টি বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদান রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান উপাদান হিসেবে সেসকুইটারপিন এলকোহলসমূহ (অনূন্য নয় প্রকার), বেনজাইল এসিটোন, অপরিচিত কিটোন ও হাইড্রোসিনামিক এসিডসহ কিছু এসিড পাওয়া যায়। স্থান ও গাছভেদে এসব উপাদানের প্রকার, পরিমাণ ও রাসায়নিক গঠন ভিন্ন। ফলে সুগন্ধিতেও ভিন্নতা পাওয়া যায়। খাঁটি আগর তেল হালকা সোনালী হলুদ বর্ণের। রসায়নাগারে এ তেল সংশ্লেষ করা এত কঠিন যে, সংশ্লেষিত আগর তেল প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত আগর তেলের মত সুগন্ধি ছড়ায় না। উল্লেখ্য যে, জাপান কৃত্রিম আগর তেল তৈরিতে অগ্রগামী। রসায়নাগারে তৈরি এ ধরণের কৃত্রিম আগর তেল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশেষ করে থাইল্যান্ডের বাজারে কম দামে পাওয়া যায়।

আগর বৃক্ষ প্রজাতি

বিশ্বে পাঁচটি গণের বৃক্ষে আগর পাওয়া যায়, যথা *Aetoxylon, Aquilaria, Gonystylus, Gyrinops* এবং *Phaleria*। এরা সবাই Thymelaeaceae পরিবারের অন্তর্ভূক্ত। এর মধ্যে প্রধান উৎস *Aquilaria* গণের ২৫ (মতান্তরে ১৫) প্রজাতির গাছে আগর পাওয়া যায়। সবচেয়ে ভাল গুণসম্পন্ন আগর পাওয়া যায় *Aquilaria malaccensis* Lamk. (সম নাম: *Aquilaria agallocha* Roxb.), *A. crassna, A. microcarpa, A. grandiflora* প্রভৃতি প্রজাতিতে।

বাংলাদেশের আগর বৃক্ষ প্রজাতি

বাংলাদেশে শুধুমাত্র *Aquilaria malaccensis* Lamk. প্রজাতিটি পাওয়া যায়। এক সময় বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বনাঞ্চলে, বিশেষ করে সিলেটের তদানীন্তন পাথারিয়া পরগণায়, প্রচুর আগর গাছ পাওয়া যেত। এ সব উৎস থেকে আগর কাঠ সংগ্রহ করা হতো। শত শত কাল ধরে অসাবধানী ও অবিবেচনা প্রসূত আহরণের ফলে বর্তমানে প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে এ গাছ আর দেখা যায় না। তবে বর্তমানে এসব এলাকার বসতবাড়ির আশে-পাশে, ব্যক্তি মালিকানাধীন টিলায় ও সরকারী বনভূমিতে আগর বাগান উত্তোলন করা হচ্ছে।

এ দেশে প্রাপ্ত আগর বৃক্ষ প্রায় ২০-২৫ মি. লম্বা হয় এবং বুক সমান উচ্চতায় প্রায় ২-২.৫ মি. বেড় হয়। শীর্ষদেশ ছাড়া কান্ডে ডাল-পালা তেমন থাকে না।

আগর নার্সারি পদ্ধতি

নার্সারি বা বীজতলা হচ্ছে বীজ থেকে চারা উৎপাদন কেন্দ্র, যেখানে চারা উঠানোর পর রোপণের পূর্ব পর্যন্ত যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। নার্সারি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে রোপণের সময় চাহিদামত সুস্থ, সবল ও ভাল গুণসম্পন্ন চারা প্রাপ্তির ও চারার যত্ন নেয়ার সুবিধা।

স্থান নির্বাচন

যেখানে বর্ষার পানি উঠে না, অথচ পর্যাপ্ত আলো-বাতাস ও উত্তম পানি নিষ্কাশনযুক্ত সেখানে নার্সারি স্থাপন করা দরকার। দোআঁশ বা বেলে-দোআঁশ মাটি নার্সারির জন্য উত্তম। নার্সারির জায়গা আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার করে মাটি সমান করতে হবে এবং নার্সারির চারদিকে বেড়া দিতে হবে।

বেড তৈরি

নার্সারির পরিমাণ ও আকৃতির উপর বেড তৈরি করতে হবে। সাধারণত বেডগুলো ১২.২ মি. x ১.২ মি. (৪০' x ৪') আকৃতির হয়। তবে লম্বায় এর চেয়ে কম বেশিও হতে পারে। দু'টো বেডের মধ্যে ৪৫-৬০ সে.মি. চওড়া খালি স্থান রাখা দরকার। এখান থেকে ৫-৭ সে.মি. (২-৩") মাটি উঠিয়ে বেডে দিতে হবে, যাতে বেড ভূমি হতে সামান্য উঁচু হয়। এতে পানি নিষ্কাশনের সুবিধা হবে। বেডের চারদিকে স্থায়ী নার্সারি হলে ইট দিয়ে, আর অস্থায়ী হলে বাঁশের খুঁটি ও তর্জ্জা দিয়ে কিনারা বাঁধাই করে দিতে হবে। দু'টি বেডের সারির মাঝখানে প্রায় ২০ সে.মি. চওড়া রাস্তা বা পরিদর্শন পথ রাখতে হবে।

মাটি প্রস্তুতকরণ

পলিথিন ব্যাগে ভরার জন্য উর্বর ভূমির উপরিভাগের ১৫-২২ সেমি. মাটি ও পঁচা গোবর অথবা আবর্জনা-পঁচা সার সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিষ্ঠিত আগর বাগানের গাছের গোড়ার মাটি সংগ্রহ করতে পারলে ভাল হয়। কারণ এ মাটিতে উপকারী ছত্রাক (যেমন *Glomus* প্রজাতি) থাকে, যা চারার বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। এরপর উক্ত মাটি গুঁড়ো করে ঘাস, শিকড়, লতা-পাতা, পাথর ইত্যাদি বেছে ফেলতে হবে। এরপর ঐ মাটি ও গোবর বা আবর্জনা-পচা সার ৪:১ অনুপাতে মিশিয়ে একস্থানে স্তূপ করে রাখতে হবে। মাটির স্তূপের উপর একটি চালা দিয়ে রাখলে ভাল হয়, যাতে প্রবল বৃষ্টিতেও ব্যাগে মাটি ভরতে কোন অসুবিধা না হয়। এপ্রিল মাসের মধ্যেই মাটি ও গোবর সংগ্রহ করে মিশ্রিত করা প্রয়োজন।

বীজ বপনের ১০-১২ দিন পূর্বে রোগ-জীবানুমুক্ত করতে মাটি শোধন করে নিতে হবে। এর জন্য একভাগ বাণিজ্যিক ফরমালিন ৫০ ভাগ পানিতে মিশিয়ে ঐ দ্রবণে নার্সারির মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে এবং পলিথিন শীট দিয়ে ঐ মাটি ৪৮-৭২ ঘন্টা ঢেকে রেখে শীট উঠিয়ে ফেলতে হবে।

আগর ফল (বামে) ও ভিতরে দু'টি বীজ (ডানে) (ছবি: ড. বক্স)

পলিথিন ব্যাগে মাটি ভর্তির পূর্বেই মাটির সাথে ইউরিয়া, টিএসপি এবং এমপি সার ২:২:১ অনুপাতে মিশাতে হবে এবং সারমিশ্রিত মাটি ব্যাগে ভরতে হবে। সাধারণত ১৭ সে.মি. x ১২ সে.মি. আকৃতির ১,০০০টি ব্যাগে ০.৮৫ ঘন মি. (৩০ ঘনফুট) গোবর মিশ্রিত মাটি দরকার হয়। এ পরিমাণ মাটিতে ইউরিয়া ২ কেজি, টিএসপি ২ কেজি এবং এমপি ১ কেজি হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে।

বেডে ব্যাগ সাজানো

ব্যাগে মাটি ভরার পর তা বেডে সারিবদ্ধভাবে সাজাতে হবে। ব্যাগের সারি সোজা রাখার জন্য প্রত্যেক সারির পর একটি করে বাঁশের কঞ্চি বা খুঁটি দিলে ভাল হয়। এতে ব্যাগ সমানভাবে সাজানো সম্ভব হয়, সারি আঁকাবাঁকা হবার সম্ভবনা থাকে না এবং পরবর্তীতে চারাগুলো সমভাবে আলো-বাতাস পেয়ে থাকে। ১২.২ মি. x ১.২ মি. একটি বেডে ১৭ সে.মি. x ১২ সে.মি. মাপের প্রায় ৩,০০০টি ব্যাগ সাজানো যায়।

বীজ সংগ্রহ

বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে আগর গাছে ফুল আসে এবং জুন-জুলাই মাসে ফল পাকে। একটি ফলে সাধারণত দু'টি বীজ থাকে। প্রতি কেজি বীজ ফলে প্রায় ১,০০০-১,১০০ টি বীজ পাওয়া যায়। ৫-৬ বছর বয়স থেকে গাছে ফুল আসা শুরু হয়। বীজ সংগ্রহের পূর্বে নির্বাচিত উন্নত মাতৃবৃক্ষ থেকে ফল সংগ্রহ করতে হবে। একটি মাতৃগাছ থেকে বীজ সংগ্রহ না করে কমপক্ষে ৫-১০টি মাতৃগাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা উচিত। কারণ আগর গাছের জীন পুল খুবই সংকীর্ণ। একই মাতৃগাছ থেকে বছরের পর বছর বীজ সংগ্রহ করে বনায়নের ফলে

বাগানের উৎপাদনশীলতা ও রোগ-বালাই প্রতিরোধক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। বিভিন্ন মাতৃগাছ থেকে সংগৃহীত বীজগুলো একত্রে মিশিয়ে শুধুমাত্র ভাল বীজ চারা উঠানোর জন্য বাছাই করতে হবে। ভাল বীজ হবে পরিপক্ক, নিরোগ, দাগহীন এবং উচ্চ (৮০%) অংকুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন। বীজ বপনের পূর্বে অংকুরোদগম পরীক্ষার মাধ্যমে বীজের সুস্থতার পরীক্ষা করা যেতে পারে।

বীজ বপন

আগরের বীজ খুব তাড়াতাড়ি অংকুরোদগম ক্ষমতা হারায় বিধায় বীজ সংগ্রহের পর বিলম্ব না করে পলিথিন ব্যাগে বীজগুলো বপন করতে হবে। বপনের পূর্বে বীজ ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। বীজ বপনের এক সপ্তাহের মধ্যে অংকুরোদগম শুরু হয় এবং এক মাসে তা সম্পন্ন হয়।

সেচ ব্যবস্থা ও অন্যান্য পরিচর্যা

বীজ বপনের পর নিয়মিত পানি সেচ ও ছায়া প্রদান করতে হয়। কারণ প্রাথমিক অবস্থায় আগর গাছ একটু ছায়ায় ভাল হয়। তাই অধিক রোদে চারার ক্ষতি হয়। ২/৩ মাস পর পর চারা পৃথক ও স্থান পরিবর্তন করে উচ্চতা অনুসারে সাজাতে হবে। বীজ বপনের ৯-১২ মাস পর চারা রোপণের সময় হলে চারায় পানি দেয়া বন্ধ করতে হবে এবং ছায়া প্রদান বন্ধ করতে হবে। এতে চারার কান্ড শক্ত হয়। নার্সারিতে চারা দ্রুত বড় করার জন্য ইউরিয়া সারের জলীয় দ্রবণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রয়োজন ও সময়মত আগাছা দমন করা দরকার। চারা গাছে রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে অতিদ্রুত সেগুলো প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

আগর বনায়ন পদ্ধতি

স্থান নির্বাচন

ভাল পানি নিষ্কাশনযুক্ত ও বন্যামুক্ত যে কোন ভুমিতে আগর জন্মাতে পারে। তবে ঢালু পাহাড়ী ভুমি আগর বনায়নের জন্য উত্তম। আগর জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায় নীচু ভূমি আগর বাগানের জন্য পরিহার করা হয়।

আগাছামুক্তকরণ

ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে নির্বাচিত এলাকার আগাছা বা ঝোপ-ঝাড় কেটে ফেলা হয় এবং সেগুলো রোদে শুকিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কোন ডাল, আগাছা, মোথা ইত্যাদি না পুড়লে পুনঃ কাটা, বাছাই ও একস্থানে স্তূপ করে পুনরায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এপ্রিল মাসের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন করতে হয়।

খুঁটি পুঁতা

আগাছা পরিষ্কার করার পর পরই খুঁটি পুঁতার কাজ শুরু করা হয়। সরকারী বনায়ন কার্যক্রমে লম্বা রশিতে চারা লাগানোর দূরত্ব অর্থাৎ ২.৭৫ মি. x ২.৭৫ মি. (৯' x ৯') অনুযায়ী কাপড় বা অন্য কিছু দিয়ে চিহ্নিত করে দু'জন শ্রমিক দু'পাশে ধরে সোজা লাইন করে প্রতি চিহ্নিত স্থানে একটি করে খুঁটি পুঁতা হয়। সাধারণত টিলা বা পাহাড়ের উপরের সমান জায়গা হতে এ কাজ শুরু করতে হয়। এতে রোপিত চারার সারি সোজা করা সহজ হয়। ২/১ দিন পর পর রশিটি পরীক্ষা করতে হয়। টানাটানিতে রশি বেড়ে গেলে ঠিক করে নিতে হয়। ঠিকমত খুঁটি পুঁতা হলে লাগানো চারার লাইনগুলো সবদিক থেকে সোজা ও সুন্দর দেখাবে। মধ্য-মে মাসের মধ্যে একাজ সম্পন্ন করা দরকার। যাহোক, স্বল্প-মেয়াদী আবর্তনকাল হলে চারা রোপণের দূরত্ব আরও কমিয়ে ১.৫ মি. x ১.৫ মি. করা যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

গর্ত খনন

সাধারণত প্রতিটি খুঁটির গোড়াকে কেন্দ্রবিন্দু ধরে ৩০ সে.মি. x ৩০ সে.মি. x ৩০ সে.মি. গর্ত খনন করা হয় এবং খুঁটিটি গর্তের এক পাশে পুঁতে রাখা হয়। ঢালু জমিতে কম সময় ও অর্থ ব্যয়ে এবং মাটির ক্ষয়রোধ কল্পে কোদালের পরিবর্তে অগার (এক প্রকার হাতলবিশিষ্ট ইস্পাতের যন্ত্র বিশেষ) ব্যবহার করা যেতে পারে।

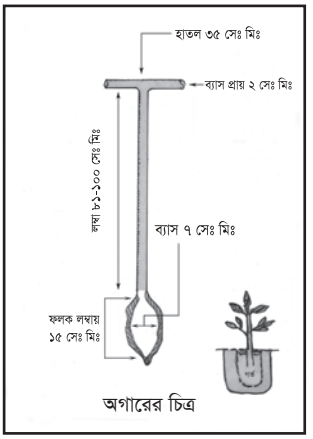

অগারের চিত্র

চারা রোপণ

৯-১২ মাস বয়স্ক প্রায় ০.৫ মি. উচ্চতাবিশিষ্ট চারা রোপণোপযোগী হয়। বৃষ্টি বা বর্ষা শুরুর সাথে সাথে নার্সারি হতে চারা নিয়ে প্রতি গর্তে একটি সুস্থ সবল চারা লাগানো শুরু করতে হবে। লাগানোর পুর্বে প্রতি গর্তের মাটির সাথে ১ কেজি পঁচা গোবর অথবা আবর্জনা পচা সার, ৫০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০ গ্রাম এমপি সার মিশাতে হবে।

চারা রোপণের সময় পলিথিন ব্যাগটি বেড বা ধারালো ছুরি দিয়ে একপাশ কেটে আস্তে খুলে ফেলতে হবে, যাতে চারার গোড়ার মাটি ভেঙ্গে না যায়। তারপর তা হাতের তালুতে করে আস্তে গর্তে বসিয়ে চারদিক হতে সমানভাবে মাটি দিতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ব্যাগে চারার গোড়া যতদুর মাটির নিচে ছিল, রোপণের সময় ঠিক ততটুকু মাটির নিচে যায়। চারার গোড়ার মাটি পাশের ভূমি হতে সামান্য উঁচু করলে বৃষ্টির পানি জমার সম্ভাবনা থাকে না। চারা রোপণের পর ৩০-৪৫ সে.মি. (১'-১.৫' লম্বা) রশি দিয়ে চারাটি পার্শ্ববর্তী খুঁটির সাথে হালকাভাবে বেঁধে দিতে হয়। খুঁটিটি শক্তভাবে পুঁতে দিতে হবে, যাতে চারা বাতাসে হেললে-দুললেও খুঁটি পড়ে না যায়। চারা রোপণের প্রায় মাস খানেকের মধ্যে নতুন পাতা গজানোর পর প্রতি চারার গোড়ায় ১০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা হয়।

২.৭৫ মি. x ২.৭৫ মি. দূরত্বে রোপিত হেক্টর প্রতি চারা লাগে ১,৩৩০টি এবং আবর্তনকাল শেষে কর্তনযোগ্য গাছের সংখ্যা পাওয়া যায় হেক্টর প্রতি প্রায় ৯০০-১,১০০টি।

বাগানের পরিচর্যা

চারা রোপণের ১-১.৫ মাস পর ১ম আগাছা দমন করতে হয়। ১ম বছরে ৪ বার, ২য় বছরে ৩ বার, ৩য় বছর অপ্রধান কান্ড কর্তনসহ ২ বার, ৪র্থ বছর ২ বার ও ৫ম বছর পরজীবি লতা কাটাসহ ১ বার আগাছা দমন করা উত্তম। তবে ১ম তিন বছর অবশ্যই এ কাজ করতে হবে। এর মধ্যে কোন চারা মরে গেলে তা পুনঃস্থাপন করতে হবে। অন্যথায় সফল বাগান সৃজন করা যায় না। সাধারণত আগর বাগান পাতলা করা হয় না। আগর গাছের মুকুটের নীচের দিকের ডালপালা প্রাকৃতিকভাবে মরে যায় এবং ঝরে যায় বলে ডালপালা ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন হয় না।

পাতাভোজী পোকাক্রান্ত আগর গাছ

এক জাতীয় মথ পোকার (*Heortia vitessoides*) শুককীট আগর গাছের প্রধান ক্ষতিকর পোকা। এরা আগর গাছের পাতা সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলে। আক্রমণ বেশি হলে প্রায় ২০% গাছ মারা যেতে পারে। বছরে দু'সময়ে এ পোকার আক্রমণ হয়। মে-জুন (মূখ্য আক্রমণকাল) ও আগষ্ট-সেপ্টেম্বর (গৌণ আক্রমণ কাল)। ছায়ায় জন্মানো গাছ থেকে উন্মুক্ত স্থানে জন্মানো গাছে বেশি আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। স্ত্রী পোকা পাতার উপর ২/৩টি গাদায় ৪০০-৬০০টি ডিম পাড়ে। শুককীট দশা ৫টি। পূর্ণ বয়স্ক শুককীট মাটির ২.৫-৫.০ সে.মি. গভীরে প্রবেশ করে লাল মুককীটে রূপান্তরিত হয় এবং এ অবস্থায় শীতনিদ্রা যায়। বছরে ৫-৬টি প্রজন্ম দেখা যায়। এক ধরণের ভাইরাসের (পলিহেড্রোসিস) আক্রমণে শুককীট মারা যায়। এক প্রকার

শোষক পোকা (*Canthecona furcellata*) শুককীট খেয়ে ফেলে। ভাইরাস আক্রান্ত শুককীট এক সপ্তাহ পানিতে ভিজিয়ে রেখে পরে সেটি পানির সঙ্গে গুলিয়ে ঐ পানি গাছে প্রয়োগ করলে ৬০-৮০% শুককীট মারা যায়।

পাতাভোজী পোকার ব্যাপক আক্রমণ হলে যে কোন স্পর্শ বিষ যেমন ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২০-২৫ মি.লি. মিশিয়ে গাছে প্রয়োগ করতে হবে।

কখনও কখনও পেরেক ঢুকানো গাছে উঁইপোকার আক্রমণ দেখা যায়। এ ছাড়া গাছে বাকলভোজী ও এক প্রকার কান্ড ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়। ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে আরও পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব হতে পারে।

আগর গাছের বৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতা

এক তথ্যে জানা যায়, শ্রীমঙ্গলস্থ বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১৯৭৬-১৯৭৭ সালে ২.৭৫ মি. x ২.৭৫ মি. (৯' x ৯') দুরত্বে রোপিত ২৬ বছর বয়স্ক বাগানের উৎপাদন হার বছরে ১৮ ঘন মিটার/হেক্টর। ১৯৯৬ সালে লাউয়াছড়া বিটে রোপিত ৮ বছর বয়স্ক বাগানের গাছের গড় উচ্চতা ৮ মিটার, বুক উচ্চতায় গড় বেড় ০.৫০ মিটার পাওয়া গেছে। ১৫ বছর বয়স্ক একটি আগর গাছ থেকে ০.২৭ ঘন মি. (৯.৫ ঘ.ফু.) কাঠ পাওয়া যায়, যা থেকে প্রায় ২৫ গ্রাম আগর তেল পাওয়া যায়।

স্বল্প দূরত্বে রোপিত ব্যক্তি মালিকানাধীন আগর বাগান

আবর্তন কাল

বড়লেখা উপজেলার আগর ফ্যাক্টরীর মালিকগণ সাধারণত ১২-১৫ বছর বয়সে পেরেক মারা আগর গাছ কেটে থাকেন। মাঠ জরিপে দেখা যায়, বুক সমান উচ্চতায় সর্বনিম্ন ৬০ সে.মি. (২') বেড়ের গাছ কর্তন করা হচ্ছে। গাছের আবর্তনকাল স্বল্প-ও দীর্ঘ-মেয়াদী হতে পারে। নিম্ন ও মধ্যমানের কাঠ ও তেল প্রাপ্তির জন্য স্বল্পমেয়াদী (১২-১৫ বছর) ও উচ্চমানের কাঠ ও তেল প্রাপ্তির জন্য দীর্ঘ মেয়াদী (৬০-৮০ বছর) আর্বতন কাল নির্ধারণ করা যেতে পারে। যাহোক, এ সব বিষয়ের উপর বিস্তারিত গবেষণা করার প্রয়োজন রয়েছে।

আয়-ব্যয়

বন অধিদপ্তরের ২০০৬ সালের এক হিসেব মতে দেখা যায়, ২.৭৫ মি. x ২.৭৫ মি. দূরত্বে রোপিত হেক্টর প্রতি চারা লাগে ১,৩৩০টি ও কর্তনযোগ্য আগর গাছ পাওয়া যায় হেক্টর প্রতি কমপক্ষে ১,০০০টি। হেক্টর প্রতি উৎপাদন ব্যয় টা. ১৩,৬৭৪। একটি ১৫ বছর বয়স্ক গাছ থেকে প্রায় ৫০ কেজি চিপ্স পাওয়া যায়, যা থেকে প্রায় ২৫ গ্রাম (প্রায় ২ তোলা) আগর তেল পাওয়া যায়। প্রতি তোলা তেল টা ৫,০০০ হিসেবে হেক্টর প্রতি আয় হয় (১,০০০ x ২ x ৫,০০০ টাকা) প্রায় ১ কোটি টাকা। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি থেকে অধিক লাভবান হওয়ার লক্ষ্যে আগর বাগানের নিচে সাথী ফসল হিসেবে বিভিন্ন সবজী, ফল, মসলা, ভেষজ উদ্ভিদ ইত্যাদির চাষ করা যেতে পারে।

ধুপের নার্সারি উত্তোলন কৌশল ও সংরক্ষণ

পরিচিতি

ধুপ বড় আকৃতির চির সবুজ বৃক্ষ। এটির বৈজ্ঞানিক নাম *Canarium resiniferum* এবং ইহা Burseraceae পরিবার ভূক্ত। স্থানীয়ভাবে এটি পৈরাগ (চট্টগ্রাম), ধুনা (খাসিয়া), বেরি রাতা (সিলেট), বড় রাতা (টিপরা) নামে পরিচিত। এটি পর্ণমোচি এবং অর্ধ চিরহরিৎ বনে পাওয়া যায়। ইহা প্রায় ৩০-৩৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। কান্ড সরল, সোজা ও নলাকার। বাকল পুরু, সবুজাভ ও সুগন্ধিযুক্ত এবং বাকলের উপরিভাগ লম্বালম্বিভাবে ফাটল ও খাঁজযুক্ত। পাতা যৌগিক, পত্রফলক লম্বায় ৩০-৬০ সেমি এবং ৩-১৩ টি পত্রকযুক্ত। পত্রকগুলো বোটাযুক্ত, উপবৃত্তাকার, লম্বায় ৭.৫-২০ সেমি, কিনারা মসৃণ, ও আগা সূচালো। ফল ড্রুপ জাতীয়, বীজ তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, সাধারণত একটি মাত্র ভ্রুণ থাকে। বীজ ত্রিকোণাকার, লম্বায় ২.৫-৪.৮ সেমি. এবং চওড়ায় ১.৮-২.২ সেমি. পর্যন্ত হয়। পরিপক্ক ফল গাঢ় ধুসর রঙের। কাঁচা অবস্থায় প্রতি কেজিতে ৯০-১০০ টি বীজ থাকে। খোসা ছড়ানোর পর প্রতি কেজিতে ১৮০-২২০ টি বীজ থাকে।

বিস্তৃতি

বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, নাইজেরিয়া, মাদাগাস্কার ও অষ্ট্রেলিয়াতে ধুপ গাছ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটের বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো কিছু ধুপ গাছ দেখা যায়। Indian Institute of Forest Management এই উদ্ভিদটিকে বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ হিসেবে ঘোষণা করেছে। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের (২০১২) তফসিল-৪ এ ধুপ গাছকে রক্ষিত উদ্ভিদ (protected plant) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ব্যবহার

ধুপ গাছের বাকলের ক্ষতস্থান থেকে Dammar বা Sambrani নামক রেজিন পাওয়া যায়। ঔষধ তৈরিতে এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এই রেজিন ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে উপজাতি এবং গ্রাম্য মানুষ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ধুপ ব্যবহার করে থাকেন। ধুপ থেকে যে অপরিশোধিত ঔষধ পাওয়া যায় তা প্রদাহ প্রতিরোধী, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকনাশক। এছাড়াও ধুপ টিউমার রোধী, যকৃত রক্ষা করে, এন্টিঅক্সিডেন্ট গুণ সম্পন্ন ও ডায়াবেটিক প্রতিরোধ করে। চর্মরোগ, হার্নিয়া, যৌনরোগ, মৃগীরোগ, হাঁপানি, জ্বর এবং বাতজ্বরের চিকিৎসায় ধুপ ব্যবহৃত হয়। হাড়ভাঙ্গাতে প্লাষ্টার হিসেবে ধুপ ব্যবহৃত হয়। হিন্দু ধর্মালম্বীরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ধুপ জালিয়ে ধোঁয়া দিয়ে থাকেন, এতে করে ধুপের ধোঁয়ায় ঘরের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় ও মশা-মাছির উপদ্রব কমে। সিজন করা ধুপ কাঠ দিয়ে প্লাইউড, ভিনিয়ার, পার্টিশন, ঘরের খুটি ও প্যাকিং বক্স তৈরি করা যায়। বীজের শাঁস খাওয়া যায় এবং বীজের তেল কনফেকশনারীতে ব্যবহৃত হয়।

ধুপের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে এই উদ্ভিদটি পাওয়া গেলেও বর্তমানে নির্বিচারে আবাসস্থল ধ্বংসের ফলে দিন দিন এই উদ্ভিদটি আশংকাজনকহারে কমে যাচ্ছে। তবে মৌলভীবাজারের আদমপুরে বীটে ৫৬ টি ধুপ গাছ সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে, যাদের গড় উচ্চতা ৩০-৩২ মিটার এবং বেড় ১.২

থেকে ২.৫ মিটার। এছাড়াও লাওয়াছড়া, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি এবং কক্সবাজার এলাকায় অল্প কয়েকটি বৃক্ষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ উদ্ভিদটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ ধুপ এর নার্সারি উত্তোলন কৌশল উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

ফুল ফল ও বীজ সংগ্রহ

ধুপ গাছে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে কিছু পাতা ঝরে যায় এবং মার্চ-এপ্রিল মাসে হালকা সুগন্ধিযুক্ত সাদা ফুল ফোটে। আগস্টের শেষের দিক থেকে সেপ্টেম্বর মাসে ফল পরিপক্ক হয়। তবে সেপ্টেম্বর মাসের শেষার্ধ (শেষ ২ সপ্তাহ) ফল/বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

নার্সারি উত্তোলন কৌশল ও পরিচর্যা

ধুপের বীজ স্বল্প-আয়ু সম্পন্ন এবং বীজ সংগ্রহের ৫-৭ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। গাছ থেকে ফল বা বীজ সংগ্রহ করে ২-৩ দিনের মধ্যে বপন করলে সাধারণত অঙ্কুরোদগমের হার ৩৫-৪০%। তবে পরিপক্ক ফল সংগ্রহের দুই এক দিনের মধ্যে ফলের মাংশল অংশ চাকু দিয়ে পরিষ্কার করে বীজ বের করে পাকা মেঝে ২ দিন রোদে ভালোভাবে শুকালে বীজের শক্ত অংশ আড়াআড়িভাবে হালকা ফেটে যায়। তখন এ বীজ তৈরিকৃত বেডে ৪-৫ সেমি. দূরত্বে একটু কাত করে বপন করতে হয়। বেডে নিয়মিত পানি সেচ দিতে হয়। বীজ বপনের ২২-২৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম শুরু হয় এবং ৪৫-৫০ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম শেষ হয়। এ ক্ষেত্রে অঙ্কুরোদগমের হার ৮০-৮৫% পর্যন্ত হয়ে থাকে। বেডে চারার বয়স ১৫-২০ দিন হলে ৫" x ৬" সাইজের পলিব্যাগে স্থানান্তর করতে হয় এবং প্রায় এক সপ্তাহ হালকা শেড দিতে হয়। নার্সারিতে চারার স্বাভাবিক পরিচর্যা করতে হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসের অত্যধিক গরমের সময় দিনের বেলায় চারায় ছায়া প্রদান (শেড) এবং নিয়মিত পানি সেচের প্রয়োজন হয়। এ সময়ে চারায় ছত্রাকের আক্রমণ পরিলক্ষীত হয়। বিশেষ করে ফিউজেরিয়াম (*Fusarium*) ছত্রাকের আধিক্য দেখা যায়। আক্রান্ত হলে ডায়াথেন এম-৪৫ নামক ছত্রাকনাশক পাউডার ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করলে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। চারার বয়স ৭-৮ মাস হলে মাঠে লাগানোর উপযোগী হয়। এ সময়ে চারার উচ্চতা ৫০-৬০ সেমি. পর্যন্ত হয়।

খোসাসহ ধুপের বীজ

খোসা ছাড়ানো ধুপের বীজ

বেডে অঙ্কুরিত ধুপের চারা

পলিব্যাগে স্থানান্তরিত ধুপের চারা

বিএফআরআই ক্যাম্পাসে উত্তোলিত ধুপের বাগান

ঢাকা বোটানিক্যাল গার্ডেন এ উত্তোলিত ধুপের বাগান

সংরক্ষণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ ধুপের উদ্ভাবিত কৌশল অবলম্বনে মৌলভীবাজারের আদমপুর এলাকা থেকে ধুপের বীজ সংগ্রহ করে প্রায় ২০০০ টি চারা উত্তোলন করে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রধান ক্যাম্পাস, চট্টগ্রাম; হিংগুলি বন গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম এবং কেঁওচিয়া বন গবেষণা কেন্দ্র, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম এ স্পেসিং ট্রায়াল (২ মি. x ২ মি., ২.৫ মি. x ২.৫ মি. এবং ৩ মি. x ৩ মি.) দিয়ে ধুপের বাগান উত্তোলন করা হয়েছে। এছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ঢাকা বোটানিক্যাল গার্ডেন, কুমিল্লা বোটানিক্যাল গার্ডেন, সীতাকুন্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকো পার্ক, বাঁশখালী ইকো পার্ক, ডুলাহাজারা সাফারি পার্ক ও রামু বোটানিক্যাল গার্ডেনে ১২০০ টি চারা রোপণ করা হয়েছে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে এ বিভাগ থেকে বেশ কিছু ধুপের চারা সরবরাহ করা হয়েছে।

মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ

পাহাড়ি ভূমি চাষাবাদে প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ সারি বেষ্টনী প্রযুক্তি বা ন্যাচারাল ভেজিটেটেভ স্ট্রিপ (এনভিএস) পদ্ধতি

প্রযুক্তি টি কি?

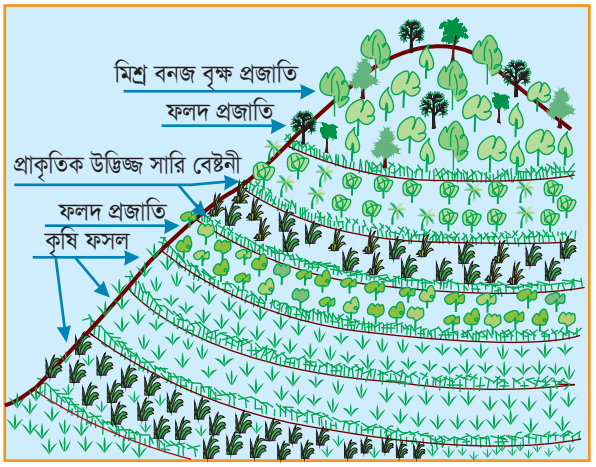

- প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ সারি বেষ্টনী প্রযুক্তি একটি পরিবেশ বান্ধব পাহাড়িভূমি চাষাবাদ পদ্ধতি।
- প্রযুক্তিটির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্থানীয় জাতের প্রাকৃতিক উদ্ভিজাত উপাদান (লতা, গুল্ম, ঘাস ইত্যাদি) সমন্বয়ে পাহাড়ি ঢালে হেজ রো বা উদ্ভিদ সারি (Hedge row) গঠন করে অন্তবর্তী উন্মুক্ত স্থানে বিভিন্ন বনজ ও ফলদ প্রজাতিসহ মৌসুমি কৃষি ফসল আবাদ করা।
- এই উদ্দেশ্যে চাষাবাদের জন্য পাহাড়ি জমি প্রস্তুত করার পর সম্পূর্ণ পাহাড়ের ঢালে A-ফ্রেম দ্বারা ৪-৮ মিটার অন্তর অন্তর ১ মিটার প্রশস্ত প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জাত বস্তু দ্বারা কন্টুর লাইন বরাবরে হেজ রো গঠন করা হয়।

  গঠিত হেজ রো এর অর্ন্তবতী উন্মুক্ত স্থানে বিশেষ করে পাহাড়ের চূড়ার দিকে বৃক্ষ প্রজাতি এবং পাহাড়ের নিচের ঢালে কৃষি ফসলাদি চাষ করতে হবে।
- ন্যাচারাল ভেজিটেটিভ স্ট্রিপ পদ্ধতিতে পাহাড়ি পরিবেশের উপযোগি বিভিন্ন স্থানীয় বনজ বৃক্ষ প্রজাতি যেমন গামার, সেগুন, গর্জন, ঢাকিজাম, তেলশুর, চাপালিশ, আকাশমনি, হাইব্রিড একাশিয়া, বহেরা, নিম, হরিতকি ইত্যাদি মিশ্র পদ্ধতিতে ২.০-২.৫ মিটার দূরত্বে লাইনে রোপণ করা হয়।
- বিভিন্ন ফলদ প্রজাতি যেমন আম, কাঠাল, জাম, লিচু, জলপাই, আমলকি, জাম্বুরা, বেল, কমলা, পেয়ারা, লেবু, কলা, পেঁপে ইত্যাদি ২.০-৪.০ মিটার দূরত্বে এবং আনারস ০.৫-০.৭৫ মিটার দূরত্বে কন্টুর লাইন পদ্ধতিতে চাষ করা হয়।
- কৃষি জাতীয় ফসলের মধ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ধান, ভূট্টা, বিভিন্ন সবজী, ডাল, তৈল ও তন্তু, আদা, হলুদ জাতীয় কৃষি ফসল চাষাবাদ করা হয়।
- এছাড়া ঘাস ও অন্যান্য সবুজ উদ্ভিজ্জ উৎপাদনের মাধ্যমে (যার পরিমাণ বৎসরে প্রায় ১০-১৫ টন) প্রায় ৪-৮ টি ছাগল বা ভেড়া পালন করা সম্ভব।

কিভাবে করবেন

জমি নির্বাচনঃ নিচু, মাঝারি কিংবা উঁচু, অনধিক ৫০-৬০% খাড়া পাহাড়ি ভূমি এ পদ্ধতিতে চাষ করা যায়। আনুমানিক ভাবে পাহাড়ি ঢাল বুঝার উপায় হচ্ছে: যখন সোজা হয়ে পাহাড়ে উঠা যাবে তখন ঢাল <৩০%; উঠতে হাঁটু বাঁকা হলে ঢাল >৩০%; হাঁটু ও শরীর বাঁকা হলে ঢাল >৪৫% এবং হাঁটু ও শরীর বাঁকা সহ লাঠিকে ভর করে উঠতে হলে ঢাল >৬০% (চিত্র ১)। এছাড়া, সঠিক ভাবে পাহাড়ি ঢাল মাপার জন্য লেবেলার, ক্লিনোমিটার ব্যবহার করা যেতে পারে।

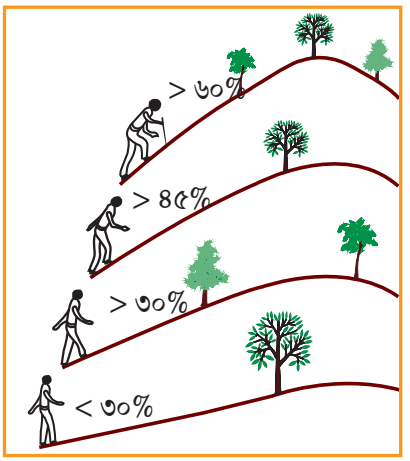

আনুমানিক ভাবে পাহাড়ি ঢাল নির্ণয় পদ্ধতি

- উল্লেখ্য যে, এনভিএস উৎপাদন প্রক্রিয়ার শুরুতে কাজের ধাপ অনুযায়ী মাঠ কার্যক্রমের একটি তালিকা প্রস্তুত করে নিলে কাজ বাস্তবায়ন সহজ হয়।
- চাষাবাদের জন্য জমি প্রস্তুতকরণ (প্রথম বৎসরে জঙ্গল কাটা, পুড়ানো, পরিস্কার করা ইত্যাদি, তবে পরবর্তী বৎসর থেকে জঙ্গল কাটা ও পুড়ানো যাবে না)।
- প্রস্তুতকৃত পাহাড়ি জমির উচ্চ, মধ্য ও নিচু ঢালে ৪-৮ মিটার দূরত্বে A-ফ্রেম দ্বারা ১ মিটার প্রশস্ত কন্টুর লাইন চিহ্নিত করে প্রাকৃতিক হেজ রো সৃষ্টি করা।
- সাধারণত জঙ্গল কাটা ও পুড়ানোর পর নির্দিষ্ট দূরত্বে ১ মিটার প্রশস্ত কন্টুর সারি চিহ্নিত করে প্রাকৃতিকভাবে পুনঃসৃজনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক উদ্ভিদ সারি বেষ্টনী স্থাপন সহজতর।
- পাহাড়ের নিম্ন ঢালে ও সংলগ্ন পাদদেশে মে-জুন মাসে হেজ রো সমূহের অন্তবর্তী উন্মুক্ত স্থানে ধান, ভূট্টা, সবজি, ডাল ইত্যাদি কৃষি ফসলের চাষাবাদ শুরু করতে হবে।
- পাশাপাশি বর্ষা মৌসুমের শুরুতে (জুন-জুলাই মাসে) কাঙ্খিত বন ও ফল জাতীয় প্রজাতির চারা রোপণের উদ্যোগ নিতে হবে।
- ফসল ভেদে আবাদকৃত সকল ফসলের যথাযথ ভাবে পরিচর্যা যেমন আগাছা পরিস্কার, সার প্রয়োগ, রোগ-বালাই দমন, চারাগাছে খুঁটি দেওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।
- যথাযথ ভাবে সময়মত ফসল সংগ্রহ, মাড়াই, সংরক্ষণ ও বাজারজাত করণে উদ্যোগী হতে হবে।
- সময়মত পরবর্তী বৎসরের চাষাবাদের প্রস্তুতি (দ্বিতীয় বৎসর থেকে ক্রপ রোটেশন বা ফসল আবর্তন অনুসরণ করা যেখানে অধিক হারে নাইট্রোজেন সংযোজনকারী ফসলের উপস্থিতি বাঞ্চনীয়) নিতে হবে।

অ- ফ্রেম এর ব্যবহার

A-ফ্রেম হচ্ছে ইংরেজি A- অক্ষর আকৃতির একটি ফ্রেম যা ১.৫-২.০ মিটার লম্বা ও সোজা বাঁশ বা কাঠের ২ টি ফালি এবং ১.০-১.৫ মিটার লম্বা ১ টি মোট ৩ টি ফালি দিয়ে তৈরি করে মাঠে ব্যবহার করা যায়।

লম্বা ও সোজা বাঁশের টুকরা দুটি একত্রে সমান জায়গায় দাঁড় করিয়ে অগ্রভাগে বেঁধে নিই। নিচের দিকে আড়াআড়ি ভাবে A-অক্ষরের মত অন্য বাঁশের টুকরা অপর দুটি বাঁশের দুই ধারে বেঁধে নিলেই A-ফ্রেম তৈরি হয়ে যাবে।

এবার, আড়াআড়ি ভাবে স্থাপিত বাঁশের টুকরার মধ্য বিন্দু চিহ্নিত করি এবং উপড়ে রশি বেঁধে রশির নিচে একখন্ড পাথর টুকরার সহিত বেঁধে এমন ভাবে ঝুলিয়ে দিই যেন স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা মধ্য বিন্দুর চিহ্নিত দাগ বরাবর ঝুলে থাকে।

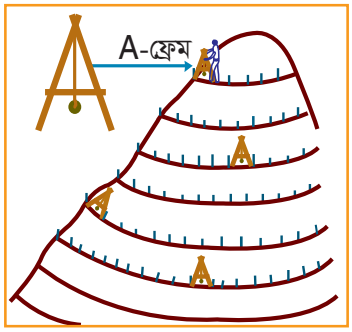

A-ফ্রেম ও প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ সারি বেষ্টনী পদ্ধতির চাষাবাদে পাহাড়ি ভূমিতে কন্টুর লাইন তৈরিতে ইহার ব্যবহার।

যে স্থান থেকে কন্টুর লাইন তৈরি করা হবে সেখানে ফ্রেমের একটি পা বসিয়ে অন্য পা টি কন্টুর বরাবর সেই স্থানে স্থাপন করি যেন ঝুলন্ত রশিটি আড়াআড়ি স্থাপিত ফালির মধ্য বিন্দুতে মিলে যায়। অতঃপর ফ্রেমের দুই পায়ের স্থান দুটি কাঠি পুঁতে চিহ্নিত করি এবং এইভাবে কাঠি পুঁতে অগ্রসর হতে হতে যে লাইন তৈরি হয়, সেটিই হবে কন্টুর লাইন।

ব্যবস্থাপনা

এনভিএস উৎপাদন পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা তুলনামূলক ভাবে সহজ। তবে, নিবিড় চাষাবাদ প্রক্রিয়ার আওতাধীন এ প্রযুক্তির মাঠ ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট যত্নবান হতে হবে। বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ যথাসম্ভব কন্টুর পদ্ধতিতে করা প্রয়োজন। এ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে বিশেষভাবে মনযোগী হতে হবে যেন গাছ ও ফসলের উচ্ছিষ্টাংশ (লতা, পাতা, খড় ইত্যাদি) ব্যাপক ভাবে ঢালু পাহাড়ের মাটিতে পঁচিয়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়।

আয়-ব্যয়

এনভিএস পদ্ধতির সুষ্ঠু মাঠ প্রয়োগ ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পাহাড়ি কৃষক যথেষ্ট লাভবান হতে পারে। প্রথম বৎসর এই পদ্ধতির মাঠ বাস্তবায়নে হেক্টর প্রতি ১২-১৮ হাজার টাকা খরচ হয়। অপরপক্ষে, প্রথম ১-৩ বৎসর গড়ে হেক্টর প্রতি মোট ১৫-৩৫ হাজার টাকা আয় করা যায়। পরবর্তীতে, ফল ও বনজ বৃক্ষের উৎপাদনের ভিত্তিতে আয় ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে যা গড়ে ৫০-৮০ হাজার টাকারও অধিক।

উপকারিতা ও প্রভাব

- এই চাষাবাদ পদ্ধতিতে ভূমিক্ষয় কমে, মৃত্তিকার পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত পাহাড়ি মাটির উর্বরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।
- এ পদ্ধতিতে একই জমিতে স্থায়ীভাবে চাষবাস করে একক ব্যবস্থাপনায় অধিক খাদ্য, কাষ্ঠ, জ্বালানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করা যায়।
- এনভিএস চাষাবাদ প্রযুক্তি পাহাড়ি পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বৃক্ষরোপণে পরিবেশ বান্ধব ও অর্থ সাশ্রয়ী অগার হোল (Augar hole) প্রযুক্তির ব্যবহার

প্রযুক্তিটি কি

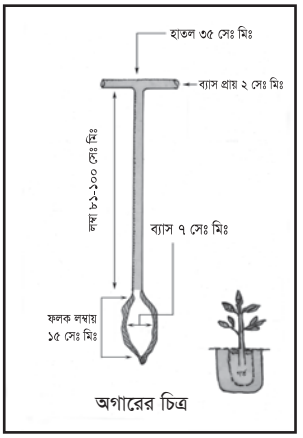

অগারের চিত্র

- অগার হোল প্রযুক্তির অগার নামক যন্ত্রটি মূলত: ডাচ্ অগার হিসাবে সর্ব্বাধিক পরিচিত। মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এই যন্ত্রটিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রূপান্তরিত অবস্থায় বৃক্ষ চারা রোপণে উপযোগী করে তোলা হয়েছে।
- ইহা অল্প চাষে (মিনিমাম টিলেজে) ও স্বল্প খরচে সহজ উপায়ে ঢালু ভূমিতে বৃক্ষ চারা রোপণ তথা সফল বনায়নে একটি বিজ্ঞান সম্মত ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি।
- প্রচলিত উপায়ে ঢালু ভূমিতে কোদাল দ্বারা গর্ত করে চারা রোপণে যে সকল সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় অগার হোল পদ্ধতিতে তা অনেকাংশে হয় না।
- ঢালু ভূমিতে সহজ ভাবে দাঁড়িয়ে কোদাল দিয়ে সঠিক আকারের গর্ত করা কষ্টসাধ্য কিন্তু অগার দিয়ে অনায়াসে তা করা যায়। কোদাল দিয়ে করা গর্তে অগারের তুলনায় প্রায় ১৫-২০ গুণ বেশি মাটি খনন করতে হয় যার ৫০-৬০% চারা রোপণের পর অব্যবহৃত থাকে অর্থাৎ হেক্টর প্রতি প্রায় ১৭ টন মাটি অপচয় হয়।
- ঢালু ভূমিতে কোদাল দিয়ে করা গর্তের আয়তন যথেষ্ট বড় এবং অধিক মাটি খননের ফলে বর্ষা মৌসুমে ভূমিক্ষয়ের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। এতে, মাটির জৈব পদার্থ, পুষ্টি মৌল ইত্যাদি অপসারিত হয়ে মাটির উর্বরতা কমতে থাকে যা অগার দিয়ে করা গর্তের ক্ষেত্রে প্রায় ঘটে না বললেই চলে।
- ঢালু ভূমিতে কোদালের গর্ত অপেক্ষা অগার দিয়ে করা গর্তের আকার সাধারণত: ছোট ও সঠিক আকারের হয় বলে বিভিন্ন সাইজের (৫ সে.মি. x ১০ সে.মি., ৭ সে.মি. x ১২ সে.মি., ১০ সে.মি. x ১৫ সে.মি., ১২ সে.মি. x ১৭ সে.মি.) পলিথিন ব্যাগে উত্তোলিত বনজ ও ফলদ প্রজাতির চারা সহজে রোপণ করা যায়।
- অগার হোল পদ্ধতিতে বৃক্ষ চারা রোপণে কোদালের তুলনায় প্রায় তিন গুণ সময় কম লাগে। এতে বনায়নে শ্রমিক সংখ্যা তিন গুণ কম হয় এবং চারা রোপণে ব্যাপক আর্থিক সাশ্রয় হয়।
- অগার দিয়ে করা গর্তে বিভিন্ন প্রজাতির রোপিত চারার বর্ধন ও বেঁচে থাকার হার কোদাল দিয়ে করা গর্তের তুলনায় সমান বা ক্ষেত্র বিশেষে অধিক। তবে, বর্ষা মৌসুমে (জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত) যখন মাটিতে যথেষ্ট পরিমানে জলীয় অংশ থাকে তখন চারা রোপণ করা শ্রেয়।

কিভাবে গর্ত করবেন

- প্রথমে লোহার তৈরি একটি অগার সংগ্রহ করুন অথবা স্থানীয় কর্মকার দিয়ে সঠিক মাপের একটি অগার প্রস্তুত করে নিন। এ বিষয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, ষোলশহর, চট্টগ্রাম এর সহিত যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ঢালু ভূমিতে অগার হোল পদ্ধতি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের একটি দৃশ্য

- এবার চিহ্নিত স্থানের কাঠি সরিয়ে নির্দিষ্ট বিন্দুতে অগারের অগ্রভাগ স্থাপন করে দাঁড়ানো অবস্থায় উপরের হাতল ধরে একই সঙ্গে চাপ দিন ও হালকা ভাবে ঘুরাতে থাকুন। এইভাবে, অগারের অগ্রভাগের লোহার ফলা দুটি ধীরে ধীরে মাটিতে ভিতরে প্রবেশ গর্ত হয়ে যাবে। অগারটি ঘুরানোর কারণে লোহার ফলা দিয়ে কর্তন করা মাটি ফলা দুটির মাঝে জমতে থাকবে যা ২-৩ বার গর্ত থেকে উঠিয়ে গর্তের পার্শ্বে রাখতে হবে। এইভাবে অতি সহজে কাঙ্খিত চারা রোপণের জন্য গোলাকার গর্তটি তৈরি হয়ে যাবে।
- এবার চারার গোড়া থেকে পলিথিন ব্যাগটি বিচ্ছিন্ন করে মাটিসহ উহা গর্তে স্থাপন করে গর্তের ফাঁকা অংশে আলগা মাটি দিয়ে এমন ভাবে চেপে দিতে হবে যেন গাছের গোড়া মাটির উপরিভাগ বরাবর সোজা থাকে। এই ভাবে অগার দিয়ে চারা রোপণের কাজ সম্পন্ন করা যাবে।
- এইভাবে প্রস্তুতকৃত বা সংগৃহীত অগারটি মাঠে ব্যবহার করা যাবে। তবে, ঢালু ভূমিতে কাঙ্খিত প্রজাতির চারা রোপণের দূরত্ব কত হবে সেই অনুযায়ী কাঠি পুঁতে গর্তের স্থান আগেই চিহ্নিত করে রাখতে হবে।

কোথায় অগার ব্যবহার করবেন

- ঢালু ভূমি বিশেষ করে পাহাড়ি ঢালে, রাস্তা কিংবা বাঁধের ঢালে, রেল লাইনের ধারে অগার দিয়ে সঠিক আকারের গর্ত করে বিভিন্ন সাইজের পলিথিন ব্যাগে উত্তোলিত বনজ ও ফলদ প্রজাতি চারা কম খরচে ও কম সময়ে সফলতার সহিত রোপণ করা যায়। এছাড়া, উপকুলীয় অঞ্চলে ও অন্যান্য সমতল ভূমিতেও সফল ভাবে বৃক্ষ চারা রোপণে অগার হোল পদ্ধতি কার্যকর। পলিথিন ব্যাগে উত্তোলিত বিভিন্ন শাক-সবজীর চারাও এই পদ্ধতিতে কম খরচে রোপণ করে কৃষক লাভবান হতে পারে।

উপকারিতা ও প্রভাব

- ঢালু ভূমিতে অগার হোল পদ্ধতিতে স্বল্প খরচে ও কম সময়ে বিভিন্ন সাইজের পলিথিন ব্যাগে উত্তোলিত বনজ ও ফলদ প্রজাতি চারা সফলতার সহিত রোপণ করা যায়।
- অগার হোল পদ্ধতিতে রোপিত চারার বর্ধন ও বেঁচে থাকার হার কোদাল দিয়ে করা গর্তের তুলনায় সমান বা ক্ষেত্র বিশেষে অধিক।
- অগার দিয়ে জুম চাষের ঢালু জমিতে ধানের মাঝে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ চারা রোপণে খুবই সহায়ক। বিশেষ করে, মহিলা/মেয়েরা কোদালের চেয়ে অগার দিয়ে স্বাচ্ছন্দে চারা রোপণ করতে পারে।
- এছাড়া, অগার দিয়ে বেড়া বা লাইভ ফেন্সিং এর জন্য মান্দার, সাজনা, বেত, পাটি-পাতা ইত্যাদির ডাল/চারা রোপণ বা বেড়ার খুটি লাগানো খুবই সহজ।

  ঢালু ভূমিতে অগার হোল পদ্ধতিতে চারা রোপণ করলে ভূমিক্ষয় কম হয় এবং মাটির উর্বরতা সংরক্ষিত হয়।

ঢালু ভূমিতে অগার হোল পদ্ধতি ব্যবহার করে গাছের চারা রোপণ

বন রক্ষণ বিভাগ

নার্সারির বনজ চারার পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই এবং ব্যবস্থাপনা

পোকা-মাকড়

মেহগনির ডগা ছিদ্রকারী পোকা ও তার প্রতিকার

Hypsiphyla robusta Moore (Pyralidae: Lepidoptera)

মেহগনি একটি মূল্যবান কাঠের বৃক্ষ। নির্মাণ সামগ্রী ও আসবাবপত্র তৈরিতে এ গাছের কাঠ খুবই সমাদৃত। দেশে বনজ সম্পদ বৃদ্ধি ও কাষ্ঠ সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত দু' তিন দশক ধরে বৃক্ষ রোপণ ও বনায়ন কর্মসূচি বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তি মালিকানায় ব্যাপক বৃক্ষ রোপণ করা হচ্ছে। বনাঞ্চল ছাড়াও মহাসড়ক, রেলপথ, নদীর পাড়, বাড়ির আঙ্গিনায়, এমন কি কৃষি জমিতেও মেহগনি চারা রোপণ করা হচ্ছে। বনায়ন ও বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশী লাগানো হচ্ছে মেহগনি। মেহগনি গাছের ডগা এক ধরনের পোকার আক্রমণে শুকিয়ে মরে যায়। এ পোকা মেহগনির ডগা ছিদ্রকারী পোকা বলে পরিচিত।

পোকার পরিচিতি

বাংলা নাম: মেহগনির ডগা ছিদ্রকারী পোকা, ইংরেজী নাম Mahogani shoot borer বৈজ্ঞানিক নাম *Hypsiphyla robusta* মেহগনির ডগা ছিদ্রকারী পোকা এক ধরনের মাঝারি আকৃতির ধূসর রঙের মথ। পূর্ণাঙ্গ পোকার দৈর্ঘ্য প্রায় ১ সে.মি.। পোকা সাধারণত: রাতে চলাফেরা করে। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকার পাখার বিস্তৃতি ২৮-৪২ মি.মি. এবং পুরুষ পোকার ২৬-৩২ মি.মি.। পূর্ণাঙ্গ পোকা ১০-১২ দিন বাঁচে। একটি পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকা কচি পাতায় কুঁড়ি অবস্থায় প্রায় ৪০০-৬০০ টি ডিম পাড়ে। ৪-৫ দিনের মধ্যে ডিম হতে কীড়া বের হয়। এদেরকে শুককীট বলা হয়। শুককীটগুলো চারটি ধাপে বড় হয়ে ৪৫-৫০ দিনে মুককীটে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে মুককীট হতে ১০-১৫ দিনে পূর্ণাঙ্গ মথ বের হয়। ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ পোকা হতে প্রায় ২ মাস সময় লাগে। ফলে বছরে পোকার ৫-৬টি প্রজন্মের সৃষ্টি হয়।

ক্ষতির ধরণ

- প্রাথমিকভাবে শুককীট ডগায় ছিদ্র করে প্রবেশ করে এবং কাণ্ডে লম্বালম্বি সুড়ঙ্গ তৈরি করে কাণ্ডের শাঁস খায়। কান্ডে ৬০ সে.মি.পর্যন্ত দীর্ঘ সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হয়।

- চারা গাছের ডগা শুকিয়ে মরে যায়।
- কখনও কখনও ফুলের বোঁটা, পুষ্পমঞ্জুরী ও ফলের ভিতরের শাঁস খেয়ে ফেলে।
- ডগার ছিদ্র মূখে পোকার বিষ্ঠা ও আঠালো রস লেগে থাকে।
- মূল ডগা আক্রান্ত হয়ে মরে গেলে নীচের অংশ থেকে অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা গজায়। এতে কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হয় না।
- ঘন ঘন আক্রমণের ফলে গাছ মরে যায় অথবা গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি সম্পূর্ণ বাগান বিনষ্ট হতে পারে।

আক্রমণের সময়

- সাধারণত বসন্ত কালের শেষে এবং গ্রীষ্মের শুরুতে গাছে যখন নতুন ডগা গজায় তখন পোকার আক্রমণ শুরু হয়।
- আমাদের দেশে বৈশাখ মাসে (মে মাস) পোকার আক্রমণ শুরু হয় এবং আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাস পর্যন্ত চলতে থাকে।
- ২ থেকে ৩ বছর বয়সের চারায় সবচেয়ে বেশি পোকার আক্রমণ হয় তবে ৭ বছর বয়স্ক গাছেও আক্রমণ হতে পারে। উন্মুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল স্থানে চারা লাগালে ডগা ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ বেশি দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

ক) প্রতিরোধ ব্যবস্থা

আমরা জানি, প্রতিকারের চেয়ে পোকা আক্রমণ প্রতিরোধই উত্তম। সাধারণত কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সহজেই পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়, যেমনঃ সুস্থ সবল মাতৃবৃক্ষ হতে বীজ সংগ্রহ করে চারা উত্তোলন করে বাগান করতে হবে।

- বাগান নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যাতে আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে পোকা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
- চারা রোপণের পূর্বে পরিমাণমত গর্ত করে সুষম জৈব ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে চারা রোপণ করতে হবে।
- আংশিক বা পার্শ্ব ছায়াযুক্ত স্থানে মেহগনির বাগান করলে পোকার আক্রমণ কম হয়।
- উন্মুক্ত ও রৌদ্রোজ্জ্বল স্থানে মেহগনি চারা না লাগানো ভাল। যদি লাগাতে হয় সে ক্ষেত্রে দ্রুত বর্ধনশীল গাছ যেমন ইপিল-ইপিল, মিনজিরি, কড়ই ইত্যাদি গাছের সাথে মেহগনির মিশ্র বাগান করা যেতে পারে। এতে মেহগনি গাছে আংশিক ছায়া হবে, ফলে পোকার আক্রমণ কম হবে।
- বাগান করার সময় তুন, চিকরাশি জাতীয় কোন চারা মেহগনির সাথে একত্রে লাগানো যাবে না।
- বাগান পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, এতে পোকার আক্রমণ কম হবে।

(খ) প্রতিকার ব্যবস্থা

- পোকা আক্রমণ দেখামাত্র আক্রান্ত ডগা পোকাসহ কেটে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে অথবা আক্রান্ত ডগা ধারালো ছুরি বা ব্লেড দিয়ে কেটে পোকা মেরে ফেলতে হবে।
- আক্রান্ত ডগা আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে পোকার অবস্থান নির্ণয় করে সুঁচ ফুটিয়ে পোকার শুককীট খুঁচিয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পোকায় আক্রান্ত বাগানে প্রতি গাছে ৬-১০ গ্রাম কার্বোফুরান-৩জি (ফুরাডান, সানফুরান, ব্রিফার ইত্যাদি) দানাদার অন্তর্বাহী কীটনাশক গাছের গোড়ায় ২০ সে.মি. ব্যাসের মধ্যে মাটিতে ছিটিয়ে মিশাতে হবে এবং পর্যাপ্ত পানি দিতে হবে, যাতে ঔষধ গাছের শিকড়ে পৌঁছায়। নার্সারিতে প্রতি শতক জমিতে ৪০-৫০ গ্রাম ঔষধ ছিটালে উপকার পাওয়া যায়।

সব ধরণের কীটনাশকই মাছ, পশু-পাখি ও মানুষের জন্য ক্ষতিকর, তাই কীটনাশক প্রয়োগের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি

কাঠ বাদামের পাতাভোজী পোকা ও তার ব্যবস্থাপনা

Metanastria hyrtaca Cramer (Lasiocampidae: Lep.)

পোকার পরিচিতি

এরা প্রাণিজগতের Arthropoda পর্বের Lepidoptera বর্গের Lasiocampidae গোত্রের অন্তর্ভূক্ত এক ধরণের মথ জাতীয় পতঙ্গ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Metanastria hyrtaca*। এ পোকার শুককীট কচিপাতার একস্থান থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ পাতা খেয়ে শেষ করে ফেলে। কাঠ বাদামের পাতাভোজী পোকাটি বাদামী মথ। স্ত্রী পোকার সামনের পাখায় অনেকগুলো হালকা ও গাঢ় বাদামী আড়াআড়ি টান (Band) আছে। কিন্তু পুরুষ পোকার সামনের পাখায় খয়েরী-বাদামী দাগ বিদ্যমান, যার মাঝখানে সাদা বিন্দু আছে। শুককীটের দেহের পাশ দিয়ে শেভিং ব্রাশের মত গুচ্ছাকারে লম্বা লম্বা লোম আছে। ঘাড়ে বিদ্যমান গুচ্ছাকার লোম মাথার দুপাশ দিয়ে সামনে বাড়ানো থাকে। শুককীট ৭-১০ সে.মি. দীর্ঘ হয়। বর্ষাকালে এ পোকার আক্রমণ বেশি দেখা যায়। স্ত্রী পোকা পাতায় এবং শাখায় সারিবদ্ধ বা গুচ্ছাকারে ডিম পাড়ে। শুককীট মুককীটে রূপান্তরের পূর্বে একস্থানে জড় হয় এবং নিজ মুখ-নিঃসৃত রেশমী সুতা ও লোম দিয়ে শক্ত বাসা বা কোকুন তৈরি করে, যা গুচ্ছাকারে পাতায়, শাখায় অথবা কান্ডের বাকলে লেগে থাকে। ৭৫-১১০ দিন জীবন কাল সম্বলিত এ পোকার বছরে কমপক্ষে দু'টি প্রজন্মের সৃষ্টি হয়। কাঠ বাদাম ছাড়াও এ পোকা বাবলা, কদম, কাঞ্চন, গামার, শাল, ইউক্যালিপ্টাস, ছফেদা, বকুল, হাসনা হেনা, অর্জুন ও চাকুয়া কড়ই আক্রমণ করে।

ক্ষতির প্রকৃতি

এ পোকার শুককীট কচি পাতার একস্থান থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ পাতা খেয়ে শেষ করে ফেলে। শুককীট অনেক বড় আকারের বিধায় একই গাছে অল্প সংখ্যক থাকলেও মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম। শুককীটগুলো দিনে ছায়াযুক্ত স্থানে দলবদ্ধভাবে লুকিয়ে থাকে। রাতে এরা সক্রিয় হয়।

ব্যবস্থাপনা

ক) শুককীট হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলতে হবে।

খ) আক্রমণ বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ মি.লি. ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি অথবা ১ মি.লি. সাইথ্রিন ১০ ইসি নামক কীটনাশক মিশিয়ে চারায় প্রয়োগ করতে হবে।

অর্জুন গাছের পাতার গল পোকার আক্রমণ ও তার নিয়ন্ত্রণ

Trioza fletcheri Crawford (Psyllidae: Hem.)

অর্জুন বহুবিধ ব্যবহারযোগ্য একটি অতি পরিচিত বৃক্ষ। ঔষধি গাছ হিসাবে বিশেষ করে হৃদরোগ চিকিৎসায় এর ব্যবহার শত বছর ধরে চলে আসছে। এ ছাড়াও চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাণিজ্যিক তসর রেশম উৎপাদনেও এ গাছের চাষ হয়। আসবাবপত্র ও নির্মাণ সামগ্রী তৈরিতেও অর্জুন একটি উৎকৃষ্ট মানের কাঠ হিসেবে ব্যবহার হয়। বহুবিধ ব্যবহারের কারণে অর্জুনের চাষ জনপ্রিয় ও বিস্তৃত হচ্ছে। অর্জুন গাছে নানা ধরণের পোকা-মাকড়ের আক্রমণ হয়। তন্মধ্যে গল পোকার আক্রমণ একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ পোকার আক্রমণে নার্সারি ও চারা গাছ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পোকার পরিচিতি

বাংলা নাম : অর্জুন গাছের পাতার গল পোকা, ইংরেজী নাম : Arjun leaf gall insect

বৈজ্ঞানিক নাম : *Trioza fletcheri* Crawford

পূর্ণ বয়স্ক পোকা খুবই ক্ষুদ্র। দু' জোড়া পাখা আছে। অপূর্ণাঙ্গ পোকা বা নিম্ফ চ্যাপটা আকৃতির। এরা পাতার একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে রস চুষে খায় এবং আক্রান্ত স্থানে গুটির মত টিউমার হয়। গুটিগুলো উজ্জল এবং লাল, হলুদ বা বাদামী রঙের হয় এবং পরবর্তীতে কালচে রঙ ধারণ করে। পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকা একটি একটি করে অথবা গুচ্ছাকারে কচি পাতার উপর প্রায় ৫০০টি ডিম পাড়ে।

ক্ষতির প্রকৃতি

- ডিম ফুটে বের হওয়া অপূর্ণাঙ্গ পোকা কচি পাতার একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে রস চুষতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে সে স্থানে ছোট গুটির সৃষ্টি হয়, যাকে গল বলা হয়। নার্সারি ও চারা গাছে পোকার আক্রমণ বেশি হয়।
- চৈত্র-শ্রাবণ (এপ্রিল-জুলাই) মাসের মধ্যে গল পোকার আক্রমণ দেখা যায়।
- একটি পাতায় অসংখ্য গলের (গুটির) সৃষ্টি হয়, যার ফলে গাছ মারাত্মক পুষ্টিহীনতায় ভোগে চারা গাছ দুর্বল হয়, গাছের মান নষ্ট হয় এবং বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

(ক) প্রতিরোধ মূলক

- নিয়মিতভাবে বাগান পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যাতে আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে পোকা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেয়া যায়।
- নার্সারি বা বাগান পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এতে পোকার আক্রমণ কম হবে।
- নার্সারি বা বাগানের গাছে সুষম খাদ্যের যোগান দিতে হবে। সতেজ ও সবল গাছে পোকার আক্রমণ কম হবে।

(খ) প্রতিকার মূলক

- গল পোকার আক্রমণ দেখামাত্র পোকাসহ পাতা কেটে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে বা আগুনে পোড়াতে হবে।
- যে কোন অন্তর্বাহী বা প্রবাহমান কীটনাশক যেমন পারফেকথিয়ন, নুভাক্রন অথবা টিডো প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০-১৫ মি.লি. (বোতলের এক মুখে ৫ মি.লি. ঔষধ ধরে) ঔষধ মিশিয়ে এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে গাছের পাতা সম্পূর্ণ ভিজে যায়।

সব ধরনের কীটনাশকই মাছ, পশু-পাখি ও মানুষের জন্য ক্ষতিকর
তাই কীটনাশক প্রয়োগের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী

কড়ইএর পাতাভোজী পোকা ও তার ব্যবস্থাপনা

Eurema spp., *Catopsilia* spp. (Pieridae: Lep.)

পোকার পরিচিতি

কড়ই এর পাতাভোজী পোকার বৈজ্ঞানিক নাম *Eurema* spp.। এটি প্রাণিজগতের Arthropoda পর্বের Lepidoptera বর্গের Pieridae গোত্রের *Eurema* গণের অন্তর্ভূক্ত এক ধরণের প্রতঙ্গ। এ পোকা দেখতে উজ্জল হলুদ অথবা সাদা পাখা বিশিষ্ট। প্রাথমিক অবস্থায় শুককীটগুলো সাদা বর্ণের হয়, কিন্তু পরে তা পরিবর্তিত হয়ে সবুজ বর্ণ ধারণ করে। স্ত্রী প্রজাপতি পাতার নিচে গাদা করে অথবা একটি একটি করে ডিম পাড়ে। শুককীটগুলো প্রাথমিক অবস্থায় পাতায় দলবদ্ধভাবে থাকে এবং পরে তারা ছড়িয়ে পড়ে। *Catopsilia* গণের প্রজাপতি দেখতে হলুদাভ সবুজ স্ত্রী প্রজপতি একটি করে পাতায় ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে উজ্জল সবুজ রঙ্গের শুককীট বের হয়। পূর্নাঙ্গ শুককীট ৪০ সি. মি. পর্যন্ত হতে পারে। মুককীট ধূসর বাদামী বর্নের হয়। *Catopsilia*-এর ক্ষেত্রে জীবনচক্র সম্পন্ন করতে প্রায় ১ মাস এবং *Eurema*-এর ক্ষেত্রে প্রায় দেড় মাস সময় লাগে। মার্চ-নভেম্বর মাসে এরা সক্রিয় থাকে।

ক্ষতির প্রকৃতি

শুককীট পাতার মধ্যশিরা ছাড়া সকল অংশ খেয়ে ফেলে। ঘন ঘন আক্রমণের ফলে চারা দুর্বল হয়ে পড়ে, চারার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, এমনকি চারা গাছ মরে যেতে পারে। কড়ই ছাড়াও এরা সোনালু, রেইনট্রি, মিনজিরি, লোহাকাঠ ইত্যাদি গাছের চারা আক্রমণ করে থাকে।

ব্যবস্থাপনা

ক) নার্সারি নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক পাতায় অবস্থিত ডিমের গাদা ও শুককীট সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

খ) হাত-জাল দিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি ধরে মেরে ফেলতে হবে।

গ) নার্সারি সব সময় আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

ঘ) নার্সারিতে পতঙ্গভোজী পাখি বসার সুযোগ করে দিতে হবে, যাতে পাখি পোকার শুককীট ধরে খেয়ে ফেলতে পারে।

ঙ) আক্রমণ বেশি হলে যে কোন স্পর্শ বা পাকস্থলী বিষ যেমন ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি বা ডায়াজিনন ৬০ ই প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ মি.লি. মিশিয়ে চারার পাতা ও শাখা-প্রশাখা ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

নিমের রস শোষক বা মশক বাগ ও তার প্রতিকার

Helopeltis antonii Signoret (Capsidae: Hem.)

পোকার পরিচিতি

রস শোষক পোকার দেহ সরু ও লম্বায় ৬-৮ মি. মি. হয়। এদের মাথা চওড়া, কাল ও ঘাড় লাল, পেট কাল ও সাদা এবং পাখা সবুজাভ বাদামী। ঘাড়ের উপর লম্বা দন্ড আছে যার অগ্রভাগ মোটা। এরা নিশাচর ও সূর্যের আলো এড়িয়ে চলে। দিবাভাগে গাছের নিচের আগাছা ও অন্যান্য স্থানে লুকিয়ে থাকে। স্ত্রী পোকা কচি শাখায়, পাতার বোঁটায় অথবা মধ্য-শিরায় ছিদ্র করে এক সঙ্গে ২-৩টি ডিম পাড়ে। কয়েক সপ্তাহব্যাপী স্ত্রী পোকা এভাবে প্রায় ২০০টি ডিম পাড়ে। ৭-১০ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে কমলা রঙের বাচ্চা পোকা বা নিম্ফ বের হয়। লম্বা দেহ ও পা বিশিষ্ট এসব নিম্ফ দেখতে অনেকটা পিঁপড়ার মত মনে হয়। এদের জীবনচক্র পূর্ণ হতে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগে। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এদের সংখ্যা বেড়ে যায়। এ পোকা নিম ছাড়াও অন্যান্য পোষক গাছ যেমন পেয়ারা, কাজু বাদাম, কর্পুর, মাদার, মেহগনি, চা প্রভৃতি আক্রমণ করে থাকে।

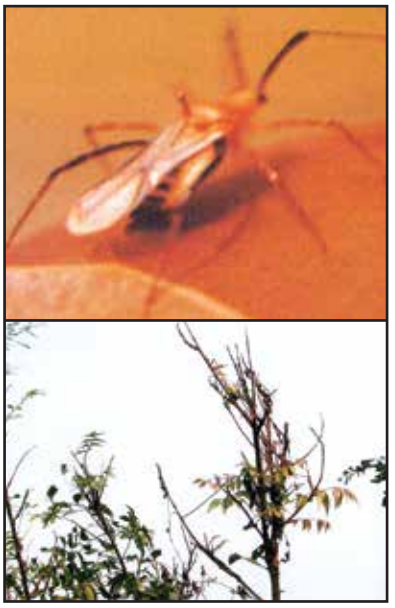

ক্ষতির প্রকৃতি

এরা চারা গাছের ও রোপণকৃত ছোট গাছের কচি শাখার নরম বাকল ও পাতা ছিদ্র করে রস শোষণ করে। এদের মুখ নিঃসৃত বিষাক্ত লালা গাছের দেহে প্রবেশের কারনে ও রস শোষণের ফলে পাতা ও শাখা কাল হয়ে কুঁকড়ে যায় অথবা সম্পূর্ণ শাখা উপর থেকে নিচের দিকে শুকিয়ে মরে যায়। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ক্ষতি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

ব্যবস্থাপনা

ক) নার্সারি সব সময় আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

খ) ডিম পাড়ার স্থান দৃষ্টিগোচর হলে সেটি কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

গ) নিমের বেডের আশে-পাশে অন্যান্য পোষক গাছের চারা উত্তোলন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ঘ) মাটিতে বেশি পটাশ সার প্রয়োগ করলে আক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে।

ঙ) ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ মি.লি. মিশিয়ে চারাগাছে এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে সম্পূর্ণ চারাগাছ ভিজে যায়।

বিভিন্ন বৃক্ষের বাকলভোজী পোকার আক্রমণ ও প্রতিকার

Indarbela quadrinotata (Indarbelidae : Lep.)

পোকার পরিচিতি

- বাকলভোজী পোকা এক ধরনের হালকা বাদামী বা ধূসর রঙের মথ।
- পাখা বিস্তৃত অবস্থায় দৈর্ঘ্য ৩.৫-৪.০ সে.মি.।
- এপ্রিল-মে মাসে পূর্ণাঙ্গ পোকা বা মথ বের হয়।
- পূর্ণাঙ্গ মথ সরাসরি গাছের জন্য ক্ষতিকর নয়, তবে শুককীট দশায় গাছের জন্য ক্ষতিকর।
- স্ত্রী মথ ১৫-২০টি ডিম গুচ্ছাকারে কান্ড বা শাখার বাকলের উপর পাড়ে। একটি মথ প্রায় ২,০০০টি ডিম দিতে পারে।
- ডিম ফুটে শুককীট বের হয়ে কান্ডে ছিদ্র করে আশ্রয় নেয় এবং রাতে বেরিয়ে এসে বাকল চিবিয়ে খায়। পূর্ণাঙ্গ শুককীট প্রায় ৪ সে.মি. লম্বা হয়।
- শুককীট ও মূককীট দশা শেষ হতে যথাক্রমে প্রায় ১০-১১ মাস ও ১ মাস সময় নেয়। সমগ্র জীবন চক্র সম্পন্ন করতে প্রায় ১ বছর সময় লাগে। তাই বছরে ১টি প্রজন্ম দেখা যায়। গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে এ পোকার আক্রমণ বেশি দেখা যায়।

পোকাক্রমণের লক্ষণ ও ক্ষতির প্রকৃতি

- ডিম ফুটে শুককীট বের হয়ে গাছের কান্ড বা শাখায় লম্বালম্বি ছিদ্র করে (সুড়ঙ্গ) আবাসস্থল তৈরি করে। সুড়ঙ্গটি অনধিক ৩০ সে.মি. দীর্ঘ হয়।
- গাছের কান্ড বিশেষ করে যে স্থান হতে শাখা-প্রশাখা বের হয় এমন স্থানে সুড়ঙ্গ তৈরি করে।
- নিজ লালা নিঃসৃত সুতা, বর্জ্য মল, বাকল ও ডাল-পালার অংশ দিয়ে গাছের বাকলের উপর দড়ির ন্যায় গাঢ় বা কালচে বাদামী রঙের চলাচল পথ তৈরি করে।
- শুককীট রাতের বেলা আবাসস্থল হতে বেরিয়ে চলাচল পথ দিয়ে বের হয়ে এসে গাছের বাকল চিবিয়ে খায় এবং দিনের বেলা কান্ডের সুড়ঙ্গে আশ্রয় নেয়।
- অতি মাত্রায় আক্রমণে গাছের কান্ড ভেঙ্গে যায় এবং শাখা শুকিয়ে মরে যায়।
- অনেক সময় সুড়ঙ্গে পানি জমে ছত্রাকের আক্রমণে গাছের কান্ডে পচন ধরে।
- আক্রমণের ফলে গাছের বা কাঠের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- মধ্য-সেপ্টেম্বর হতে জানুয়ারী মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত আক্রমণ দেখা যায়। অক্টোবর হতে নভেম্বর মাসে পোকার আক্রমণ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

যে সমস্ত গাছে বাকলভোজী পোকার আক্রমণ হয়

- বাকলভোজী পোকা বহুভোজী বলে অনেক ধরনের বৃক্ষ প্রজাতি এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৫৪ প্রজাতির ফলদ, বনজ ও অন্যান্য বৃক্ষ এ পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয় বলে জানা গেছে। আম, জাম, কড়ই, গামার, সেগুন, শাল, বাবলা, শিমুল, চিকরাশি, ঝাউ, ছাতিম, অর্জুন, বরই, লিচু, আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস, তুঁত, খৈয়া-বাবলা, কেওড়া ইত্যাদি গাছে প্রায়ই এ পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

বাকলভোজী পোকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

- বাগান পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
- পোকার পরিত্যক্ত মল, বাকল ও ডাল-পালার অংশ দিয়ে তৈরি চলাচল পথ ভেংগে পরিস্কার করে আলকাতরার প্রলেপ দিতে হবে।
- পোকার আবাসস্থলে চিকন তার বা সাইকেলের স্পোক ঢুকিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শুককীট মেরে ফেলে গর্তের মুখ কাদা মাটি/বিটুমিন/মোম দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।
- পোকার আবাসস্থলে এক টুকরো তুলা কেরোসিন তেলে ভিজিয়ে প্রবেশ করিয়ে গর্তের মূখ মাটি/বিটুমিন/মোম দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।
- পোকার আক্রমণ বেশি হলে ডায়াজিনন বা ম্যালাথিয়ন জাতীয় স্পর্শ কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ মি.লি. মিশিয়ে প্রতি গর্তে সিরিঞ্জের মাধ্যমে ৫ মি.লি. পরিমাণ ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। (কীটনাশক বোতলের মুখে ৫ মি.লি. কীটনাশক ধরে)।
- আক্রান্ত গাছের কান্ড বা বাকল স্পর্শ কীটনাশক (ম্যালাথিয়ন বা ডায়াজিনন) প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ মি.লি. মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে মেশিনের সাহায্য ভিজিয়ে দিতে হবে। এ ভাবে ১০ দিন অন্তর অন্তর ২ থেকে ৩ বার স্প্রে করলে পোকা আক্রমণ কমে যাবে।

কীটনাশক প্রয়োগে সাবধানতা ঃ
কীটনাশক প্রয়োগের সময় প্রয়োজনীয় সর্তকতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক